ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হাওরে বাঁধ নির্মাণ:

সুনামগঞ্জ পাউবো'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

একটি তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নে

এন. আলম মিল্টন
সুদীপ্ত চৌধুরী

ডিসেম্বর - ২০০৯

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), সুনামগঞ্জ
সহযোগীতায়: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রগ্রেস টাওয়ার, বাড়ি নং-০১, রোড নং-২৩, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
ওয়েব: **www.ti-bangladesh.org**

হাওরে বাঁধ নির্মাণ: সুনামগঞ্জ পাউবো'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা

এম. হাফিজ উদ্দিন খান
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন

অধ্যাপক পরিমল কান্তি দে
আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), সুনামগঞ্জ

জনাব নুরুর রব চৌধুরী, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
জনাব ধূর্য্যটি কুমার বোস, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
মো: গোলাম কিবরিয়া, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
জনাব ইনামুল হক চৌধুরী, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
জনাব মতিউর রহমান, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
জনাব নজরুল ইসলাম, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
সঞ্চিতা চৌধুরী, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
জনাব নির্মল ভট্টাচার্য, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
এ্যাড. আইনুল ইসলাম বাবলু, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
রুনা শাহিন আরা লেইস, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ
নাজনিন বেগম, সদস্য, সনাক, সুনামগঞ্জ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

এন. আলম মিল্টন, সহকারী ফেলো, গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, টিআইবি
সুদীপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সহকারী ফেলো, গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

মোহাম্মদ সেলিম, মো: আহাদ, মো: জহুরুল ইসলাম ও রঞ্জিত কুমার দে

কৃতজ্ঞতা:

মাঠ সহকারি, উত্তরদাতা এবং টিআইবির গবেষণা ও সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের সহকর্মীবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এছাড়া সুনামগঞ্জ সচেতন নাগরিক কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্যই এই গবেষণা সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে সুনামগঞ্জ এরিয়া ম্যানেজার জনাব মাহমুদ আলী বিভিন্ন সময়ে গবেষণার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং সহযোগিতা দিয়ে গবেষণার সার্বিক কাজকে আরো বেগবান করেছে। এজন্য জনাব মাহমুদ আলী'র প্রতি গবেষণা দল বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ:

গবেষণা বিভাগ, টিআইবি, ঢাকা অথবা সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), সুনামগঞ্জ ।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৪০৯৬২৩৭, ই-মেইল: nalam@ti-bangladesh.org

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

সারণির তালিকা i
চিত্রের তালিকা ii
কেস স্টাডির তালিকা iii
শব্দ সংক্ষেপ iv
প্রায়োগিক সংজ্ঞা v
গবেষণা সার-সংক্ষেপ vii-xi
প্রথম অধ্যায়: গবেষণার পটভূমি ১-৭
১.১ ভূমিকা ১
১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট ১
১.৩ বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও জলাভূমি ২
১.৪ হাওর, বাওর এবং বিল ২
১.৫ হাওর ও বাংলাদেশ ৩
১.৬ হাওরের জেলা সুনামগঞ্জ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩
১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা ৪
১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য ৫
১.৯ গবেষণা পদ্ধতি ৫
১.১০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৬
১.১১ প্রতিবেদন কাঠামো ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব এবং বাস্তবতা ৮-১৬
২.১ সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু ৮
২.২ পাহাড়ি ঢল ও অকাল বন্যা ৯
২.৩ হাওর জেলা সুনামগঞ্জের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ৯
২.৪ হাওরের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত গুরুত্ব ১৩
২.৫ জলাবদ্ধতা ও চর: হাওরবাসীর নতুন দুর্ভোগ ১৩
২.৬ হাওর উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ: প্রাণ ও জীববৈচিত্র্যের উপর চরম আঘাত ১৪
২.৭ হাওর এবং হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড ১৫
২.৮ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড ১৬

তৃতীয় অধ্যায়: সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও হাওর উন্নয়ন প্রকল্প ১৭-২১
৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৭
৩.২ অপারেশন ও মনিটরিং সার্কেলের কার্যক্রম ১৮
৩.৩ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ ১৮
৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের বর্তমান জনবল ১৯
৩.৫ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক অবকাঠামোগত নির্মাণ ২০
৩.৬ আর্থিক বরাদ্দ বা বাজেট ও ব্যয় ২০
৩.৭ হাওরের ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের ধরন, কার্যকারীতা ও প্রভাব ২০

চতুর্থ অধ্যায়: হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে সমস্যা: অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ২২-৩৪
৪.১ হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ ভাঙ্গার কারণ ২২
৪.২ পাউবো, সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ২৩
৪.৩ বাঁধ নির্মাণে টেন্ডার পদ্ধতি এবং সুনামগঞ্জের বাস্তবতা ২৪
৪.৪ বাঁধ নির্মাণে পিআইসি পদ্ধতি ২৭
৪.৫ বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ২৯
৪.৬ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ২৯
৪.৭ পিআইসি পদ্ধতিতে অনিয়ম দুর্নীতির ধরন ৩৩

	পৃষ্টা নং
পঞ্চম অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ	*৩৫-৪১*
৫.১ বাঁধ ভাঙ্গার কারণ	৩৫
৫.২ স্থানীয় বাস্তবতায় 'পিপিআর'এর কার্যকরতা	৩৭
৫.৩ পিআইসি পদ্ধতি কি সত্যিকার অর্থেই সময় সাশ্রয়ী	৩৯
৫.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া	৪০
৫.৫ হাওর রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ ও সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক	৪১
সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা	*৪২-৪৩*
সহায়ক গ্রন্থাবলী	*৪৪-৪৫*
পরিশিষ্ট	

সারণির তালিকা

	পৃষ্টা নং
সারণি-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম জলাভুমি ও তাদের আয়তন	৩
সারণি-২: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের উৎস	৬
সারণি-৩: সুনামগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ও তাদের পেশার শতকরা হার	১০
সারণি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার জমির প্রকৃতি	১১
সারণি-৫: সুনামগঞ্জ জেলার পরিবেশ বিপর্যয়ের কিছু খন্ড চিত্র ও এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ	১৩
সারণি-৬: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের অবস্থান ও কার্যক্রম এলাকা	১৯
সারণি-৭: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের জনবল	১৯
সারণি-৮: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক অবকাঠামোগত নির্মাণ চিত্র (২০০৮ সাল পর্যন্ত)	২০
সারণি-৯: ২০০৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি।	২০
সারণি-১০: 'পিআইসি' সদস্যদের পরিচিতি ও সংখ্যা	২৮
সারণি-১১: ঠিকাদার/পিআইসি সদস্যদের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের পরিমাণ	২৯
সারণি-১২: দরপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার না করার প্রবণতা	২৯
সারণি-১৩: বাঁশ ও মাটি/ শ্রমিকের ক্ষেত্রে পাউবো সুনামগঞ্জ কর্তৃক ওভার এস্টিমেশন	৩০
সারণি-১৪: পাউবো, সুনামগঞ্জ কর্তৃক কাজ 'মনিটরিং' এ অনিয়ম ও দুর্নীতি	৩১
সারণি-১৫: ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধ নির্মাণে সংগঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন	৩২
সারণি-১৬: বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কর্তৃক প্রদত্ত্ব বাঁধ ভাঙ্গার কারণ	৩৬
সারণি-১৭: প্রতিটি কাজে অনুমিত ছাড়ের পরিমাণ	৩৭
সারণি-১৮: দরপত্র প্রক্রিয়ায় কার্যাদেশ প্রদানের আনুমানিক ব্যয়িত সময়	৩৮
সারণি-১৯: হাওর এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ও ফলাফল	৪১

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্টা নং
চিত্র-১: টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও প্রতিটি ধাপের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা	২৬
চিত্র-২: 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক ধাপ ও বিদ্যমান সমস্যা	২৮
চিত্র-৩: 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র বিভিন্ন ধাপ ও গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম এবং দুর্নীতির ফ্লো-চার্ট	৩১
চিত্র-৪: বাঁধ ভাঙ্গার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির মন্তব্যের ফ্লো-চার্ট	৩৬
চিত্র-৫: পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণে ব্যায়িত সময়ের ব্যাপ্তির ফ্লো-চার্ট	৪০

কেস স্টাডি

	পৃষ্ঠা নং
কেস স্টাডি-১: প্রতিবছর ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নি:স্বতর হচ্ছে গরীব চাষীরা	১০
কেস স্টাডি-২: অচল স্লুইস গেইট ও বিপন্ন শনির হাওর	১৪
কেস স্টাডি-৩: সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ‘ডেকার হাওরের’ ফসল রক্ষা	২৩
কেস স্টাডি-৪: বাস্তবায়নের পদ্ধতি বদলায় কৃষকের ভাগ্য বদলায় না	২৪
কেস স্টাডি-৫: বাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটি আনায় হুমকীর মুখে হাওরের ফসল	২৫
কেস স্টাডি-৬: নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ব্যক্তিগত পছন্দ ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান	৩২
কেস স্টাডি-৭: ‘মানত’ বলে কথা-চাঁদা তুলে পাউবো’র মিলাদ-মাহফিল	৩৪

শব্দ সংক্ষেপ

BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BHWDB	:	Bangladesh Haor and Wetland Development Board
BWDB	:	Bangladesh Water Development Board
CNRS	:	Center for Natural Resource Studies
CRIS	:	Child Rights Initiatives Society
EIP	:	Economically inactive population
EPWPDA	:	East Pakistan Water and Power Development Authority
FAP	:	Flood Action Plan
ISPAN	:	Irrigation Support Project for Asia and Near East
IUCN	:	International Union for Conservation of Nature
MOWR	:	Ministry of Water Resources
OMC	:	Operation & Monitoring Circle
OT	:	Open Tendering
PIC	:	Project Implementation Committee
PPR-2008	:	Public Procurement Rules-2008
SRI	:	Socially Responsible Investing
TIN	:	Tax Identification Number
VAT	:	Value Added Tax
কাবিখা	:	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
কাবিটা	:	কাজের বিনিময়ে টাকা
বাপাউবো	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পাউবো-সুনামগঞ্জ	:	পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ

প্রায়োগিক সংজ্ঞা

হাওর-বাওর-বিল :**হাওর:** সাধারণত থালা আকৃতির বন্যা বিদৌত জলাভূমিকে হাওর বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২৫ শতাংশ জুড়ে হাওর ভূমি দেখা যায়। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় ৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মোট ৪২৭টি হাওর বিস্তৃত।

বাওর: বন্যাপ্রবন নদীগুলোর বিভিন্ন অংশে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির এইসব বাওর তৈরী হয় যাকে অশ্ব ক্ষুরাকৃতির হ্রদও বলা হয়। সাধারণত: বন্যাপ্রবন অঞ্চলের নদ-নদীতে কালক্রমে পলি জমে একসময় গতিপথ পরিবর্তীত হলেও কিছু অংশ পূর্বের অবস্থায় থেকে যায়। এই পরিবর্তীত অংশগুলোকেই হাওরের সাথে জুড়ে বাওর নামে অভিহিত করা হয়।

বিল: বিস্তৃর্ন এলাকা জুড়ে আবদ্ধ পানির অবস্থানকে বিল বলা হয়ে থাকে। বিলগুলো ভূ-উপরিস্থ পানির সবচেয়ে বড় আধার যা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট খালের মাধ্যমে নদীর সাথে কিংবা একটির সাথে আরেকটি যুক্ত থাকে। এ ধরনের বিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় দেখা যায়, বিশেষ করে কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা এবং পাবনা জেলায় সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

ডুবো বাঁধ :এ ধরণের বাঁধ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পানির প্রবাহকে আটকিয়ে রাখতে পারে। পরবর্তীতে স্বাভাবিক পানির প্রবাহের সময় বাঁধগুলো পানির নীচে তলিয়ে যায়। এতে করে ঐ সময়ে নৌ-চলাচলে সমস্যা হয় না। ডুবো বাঁধ বা 'সাবমারজিবল এ্যামবেকম্যান্ট' সাধারণত জলাভূমি এবং হাওর এলাকায় নির্মাণ করা হয়। ফলে ঐসব এলাকার জমিগুলো চাষের আওতায় আসে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশকেও তেমন ক্ষতি করেনা। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালের পর থেকে হাওর এলাকায় এ ধরণের বাঁধ নির্মাণ (কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তা-কাম-বাঁধ) করা হয়। যেমন: কিশোরগঞ্জের ইটনা-মিটামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার হাওর অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং হাওরের ফসল রক্ষার্থে ডুবো বাঁধ-কাম-রাস্তা নির্মাণ।

টেন্ডার পদ্ধতি :সরকারের ক্রয় নীতির কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে টেন্ডার পদ্ধতি অন্যতম। ২ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের যে কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকারি ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতো। টেন্ডার প্রকিয়ার শুরুতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজের মান এবং সম্ভাবতা যাচাই করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় কাজের গ্রহনযোগ্যতা এবং মান সম্বলিত একটি 'ডিমান্ড নোট' সরকারের অর্থ-মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে তা প্রেরণ করা হয়। উল্লেখিত যোগ্যতা অর্জনকারীরা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ফরমে প্রতিষ্ঠান বরাবর কাজের বিবরণী দাখিল করে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য দামের একটি তালিকা উল্লেখপূর্বক তারা মোট বাজেট তৈরী করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ঐ বাজেটে সর্বনিম্ন কম দর প্রস্তাবকারীকে কার্যাদেশ প্রদান করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে টেন্ডার পদ্ধতি বলা হয়।

পিআইসি পদ্ধতি :সরকারের ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহন বাড়ানো এবং কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থ-বছরে টেন্ডার পদ্ধতির বাইরে কার্য এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এবং গণ্যমান্যদের অংশগ্রহনে একটি কমিটির মাধ্যমে 'পিআইসি বা প্রজেক্ট ইমপ্লিম্যান্টেশান কমিটি'র (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) মাধ্যমে বাস্ত বায়ন করা হয়। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরপর দুই বছর পিআইসি পদ্ধতির মাধ্যমে সুনামগঞ্জের হাওরে ফসল রক্ষার বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

ভেরিয়েশান ওয়ার্ক : অনেক সময় টেন্ডার কিংবা পিআইসি পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও দেখা

যায়, কার্য এলাকার আশে-পাশে আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো জরুরী। কারণ, তা না হলে মূল কাজটিই হুমকীর সম্মুখীন হবে। এমতাবস্থায় সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসকে অবগত করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উক্ত কাজটি বাড়তি কাজ হিসেবে সম্পন্ন করে। একে 'ইর্মাজেন্সী' ওয়ার্ক বা 'ভেরিয়েশান ওয়ার্ক' নামে অভিহিত করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ভেরিয়েশান ওয়ার্কের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরিধি নির্ণয় করা হয়, সেসময় বাঁধ পানির নীচে ডুবে থাকায় অনেকটা অনুমান নির্ভর 'এ্যাসেসম্যান্ট' করার ফলে এটির আধিক্য দেখা দেয়।

'লেস' পদ্ধতি :টেন্ডার পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন কম মূল্য প্রদানকারীকে কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই সর্বনিম্ন মূল্য প্রদানকারীকে প্রাক্কলিত বাজেট থেকে বিয়োগ করে শতকরা হারে পরিবর্তিত করে কার্যাদেশে 'লেস' হিসাব করা হয়। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তি সর্বোচ্চ 'লেস' প্রদান করতে পারবে তাকেই কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম উল্লেখ রয়েছে। সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও 'লেস' ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দরদাতাদের মধ্যে একটি অসম প্রতিযোগীতা লক্ষ্য করা যায়-যা কাজের মান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী করে।

'হাওর বান্ধব' নীতিমালা :ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, পরিবেশ ইত্যাদি কারণে হাওরগুলো অন্যান্য এলাকার তুলনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। এক্ষেত্রে পরিবেশ এবং প্রতিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এসব অঞ্চলের জন্য আলাদা নীতিমালা তৈরী করাই শ্রেয় মনে করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সরকারের গৃহীত পদ্ধক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একদিকে যেমন হাওরের প্রতিবেশ এবং পরিবেশকে হুমকীর সম্মুখীন করছে তেমনি হাওর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের প্রকৃত জীবনমান উন্নয়নের সম্ভাবনাও কম থাকে। তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে হাওরের জন্য আলাদা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করার জোড় তাগাদা অনুভব করছে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন-নীতিমালাটি হবে এরকম যেন, হাওরের বাস্তবতা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে এবং সেটা অবশ্যই হাওরের অনন্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের সাথে খাপ খাবে। একেই বিশেষজ্ঞরা 'হাওর বান্ধব' নীতিমালা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সততার অঙ্গিকারনামা :বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দুটি দলের মধ্যে কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের চুক্তিনামা বা অঙ্গিকারনামা স্বাক্ষরিত হয়। এতে করে দুটি দল তাদের পারস্পরিক কর্ম-পরিধি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। এতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা দলের মধ্যে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজটি সম্পন্ন করার নৈতিক (কোন কোন ক্ষেত্রে আইনগত) বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়। অর্থ্যাৎ সততার অঙ্গিকারনামা বা 'ইন্ট্রিগ্রিটি প্যাক্ট' হলো এমন একটি অঙ্গিকারনামা যেখানে সংশ্লিষ্ট দুটি দল (এখানে পাউবো এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান) একটি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে (সাধারণ জনগণ কিংবা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি) কাজের সততা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত অঙ্গিকারনামায় স্বাক্ষর করেন। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্চতা ও জবাবাদহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের অঙ্গিকারনামা স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে হাওর-জলাভূমি। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এই সাতটি জেলায় ৪৮টি বড় হাওরসহ মোট ৪২৭টি হাওরভূমি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্ষাকালে এই হাওর ও জলাভূমিগুলো প্রায় ২৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। হাওরের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে বেশিরভাগ জমিই এক-ফসলি এবং হাওর এলাকার প্রায় ৬৭ শতাংশ জনগণ সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতি বছরে অকাল বন্যা ও পাহাড়ি ঢল এ অঞ্চলে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। হাওরের ফসল রক্ষার্থে পূর্বে স্থানীয় জনগণ সম্মিলিতভাবে বাঁধের ব্যবস্থা করত। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ সরকারের 'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়'- এর উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম চলে আসছে। প্রতিবছর কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সরকারি উদ্যোগে হাওর এলাকাগুলোতে ডুবো বাঁধ[১] (সাবমারজিবল এ্যামব্যাঙ্কমেন্ট) নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে হাওরের ফসল রক্ষার পাশাপাশি হাওরের জীব, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সুনামগঞ্জ তার কর্ম এলাকায় ডুবো বাঁধ নির্মাণ এবং তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে।

পাউবো-সুনামগঞ্জ এ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ৩৪টি হাওরে ১,৩৬৭ কিলোমিটার ডুবো বাঁধ, ৪.৫ কিলোমিটার *ক্লোজার ড্যাম*[২] এবং ৮৪টি *স্লুইচ গেট* নির্মাণ করেছে।[৩] এর জন্য গত পাঁচ অর্থবছরে (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮) মোট ৫৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ পায় যার বাৎসরিক গড় ১০,৬২,৯০,৪০০ টাকা। এর মধ্যে ৫১ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা যার বাৎসরিক গড় ১০,৩৬,১৬,৬০০ টাকা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যয় হয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাউবো-সুনামগঞ্জ চারটি পদ্ধতিতে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করেছে[৪]। এগুলো হলো, ১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) পদ্ধতি; ২) কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) পদ্ধতি; ৩) ওপেন টেন্ডার পদ্ধতি; এবং ৪) প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (পিআইসি)[৫] পদ্ধতি। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিগত কয়েক বছর টেন্ডার পদ্ধতি এবং পিআইসি পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁধ নির্মিত হয়েছে।

বর্তমানে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর ভূমিকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে স্থানীয় জনগণ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং ঠিকাদারদের সাথে অবৈধ আঁতাত সম্পর্কে অভিযোগ করছে। এর ফলে অত্যন্ত দুর্বল বাঁধ তৈরি হচ্ছে বলে তারা মনে করে। এই সকল কারণে হাওরের ফসল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, যা হাওরবাসী মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর জনগণকে প্রকৃত সেবা দেওয়া সম্ভব, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সুষম সমাজ ব্যবস্থা তৈরিতে অবদান রাখবে। সেই লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সুনামগঞ্জ সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ডুবো বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর ভূমিকার ওপর একটি তথ্যানুসন্ধানমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হলো হাওরে বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা হতে উত্তরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এছাড়াও নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে:

- হাওরে ডুবো বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত ক্রয় প্রক্রিয়া (টেন্ডার পদ্ধতি ও পিআইসি) মূল্যায়ন করা;
- হাওরের বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা;
- বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে একটি 'ধারনাপত্র' তৈরী করা।

গবেষণা পদ্ধতি

---

[১] এ ধরনের বাঁধ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পানির প্রবাহকে আটকে রাখতে পারে। পরবর্তীতে স্বাভাবিক পানির প্রবাহের সময় বাঁধগুলো পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে করে ঐ সময়ে নৌ-চলাচলে সমস্যা হয় না। সাধারণত জলাভূমি এবং হাওর এলাকায় এ ধরনের বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ঐসব এলাকার জমিগুলো চাষের আওতায় আসে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশকেও তেমন ক্ষতি করে না। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের পর থেকে হাওর এলাকায় এ ধরনের বাঁধ নির্মাণ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাস্তা-কাম-বাঁধ) করা হয়। যেমন, কিশোরগঞ্জের ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার হাওরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং হাওরের ফসল রক্ষার্থে ডুবো বাঁধ-কাম-রাস্তা নির্মাণ।

[২] হাওরের সাথে নদীর সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাকৃতিকভাবেই ছোট ছোট খাল রয়েছে। শুধুমাত্র ডুবো বাঁধ দিয়ে হাওরে পানি প্রবেশকে আটকানো সম্ভব নয় বরং হাওরের পানি প্রবেশকে আটকাতে হলে ঐসব খালের পানির প্রবাহকে সাময়িকভাবে আটকে দিতে হয়। এ কারণে ঐসব খালে বাঁধ দিয়ে সাময়িকভাবে পানি প্রবাহকে আটকে রাখার পদ্ধতিকে *ক্লোজার ডেম* নামে অভিহিত করা হয়।

[৩] পাউবো-সুনামগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ। পাউবো-সুনামগঞ্জ এছাড়াও শহর রক্ষা বাঁধ, নদী খননসহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

[৪] পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনায় এই চারটি পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন কোনো কোনো বছর স্থানীয় এনজিওগুলো দিয়েও বাঁধ নির্মাণ করা হতো। কিন্তু এই সূত্রটি পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় গবেষণায় আলোচিত হয়নি।

[৫] প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০০৫ এর অধীনে 'পিআইসি' প্রণয়ন করা হয়। এটি সরকারি ক্রয় নীতিমালার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির আওতায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে। এই 'পিআইসি' পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছর সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এই গবেষণায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে হাওর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত। তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস' (এফজিডি), দলীয় আলোচনা, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সরাসরি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। গবেষণা কর্মটির সময়কাল ছিল অক্টোবর ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত, তন্মধ্যে নভেম্বর ২০০৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত মূল তথ্য

জনবল স্বল্পতা: পাউবো-সুনামগঞ্জ এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মোট ৯৭টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে ৩৯ জন কর্মরত আছে অর্থাৎ ৫৯.৮% জনবলের শূন্যতা রয়েছে।

হাওরের ডুবো বাঁধ ভাঙ্গার কারণ: হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ হলো, বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন, দরপত্র বা ক্রয় প্রক্রিয়ায় অবৈধ লেনদেন ও আঁতাত, যথাসময়ে বাঁধ নির্মাণ না করা, বাঁধ নির্মাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবহার না করা, অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করা। এছাড়া প্রয়োজন যাচাই, নকশা প্রণয়ন ও বাঁধ নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা, অস্থানীয় ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ, স্থানীয় ভৌগোলিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সমস্যা: সার্বিকভাবে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ্যাসেসমেন্ট, বাজেট পাশ, ঠিকাদার নির্ধারণ ও বাস্ত বায়ন এই চারটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। পাউবো-সুনামগঞ্জ এর ক্রয় প্রক্রিয়ায় এই চারটি ধাপে নানান সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে। এ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে সমস্যা হলো-ওভার এস্টিমেশন, অনুমান নির্ভর এ্যাসেসমেন্ট, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, এ্যাসেসমেন্ট এর জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি। বাজেটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো হলো, হাওর রক্ষা এবং হাওরের জলজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব, প্রক্রিয়াগত জটিলতার জন্য বাজেট প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্ব এবং মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব। এছাড়া বাজেট প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতেও আনুমানিক দুই মাসের অধিক সময় প্রয়োজন হয়। সরকারি ক্রয়নীতির শর্তানুসারে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অস্থানীয় ঠিকাদারদের প্রাধান্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে বহিরাগত হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারদের দায়বদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে মূল ঠিকাদার অবৈধভাবে 'সাব-কন্ট্রাক্ট' দিয়ে থাকে। ঠিকাদারদের যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের পর সর্বোচ্চ *লেস*[৬] প্রদানকারীকে কাজ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, প্রকল্পের প্রয়োজন যাচাইয়ের পর দরপত্র আহ্বানের সময় অবৈধ আঁতাতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঠিকাদারকে কাজ পেতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি উপকরণের মূল্য তিন-চারগুণ বৃদ্ধি করে কোটেশন আহ্বান করা হয়। পরবর্তিতে অনিয়ন্ত্রিত '*লেস*' এর মাধ্যমে কার্যাদেশ গ্রহণের কারণে কাজের মান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সর্বশেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কম হওয়ায় ঠিকাদারদের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব ও দরপত্র অনুযায়ী সঠিকভাবে বাঁধ নির্মাণ না করার প্রবণতা লক্ষণীয়।

পিআইসি পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপে সমস্যা: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা যায়। এই পদ্ধতির মূল তিনটি ধাপ হলো, ১) এ্যাসেসমেন্ট, ২) বাজেট পাস এবং (৩) 'পিআইসি' কর্তৃক বাস্তবায়ন। 'টেন্ডার পদ্ধতি'র মতো 'পিআইসি' পদ্ধতিতেও এ্যাসেসমেন্ট ও বাজেট পাসের ক্ষেত্রে একই সমস্যা বিদ্যমান। এছাড়াও 'পিআইসি' কর্তৃক বাঁধের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও আত্মীয়করণ, কমিটির সদস্যদের নির্মাণ কাজে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি সমস্যাও বিদ্যমান।

বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন পদ্ধতির (টেন্ডার অথবা পিআইসি) ওপর নির্ভর করে স্টেকহোল্ডারদের ধরনে পরিবর্তন হলেও দুটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি ঘটে এবং এগুলোর সাথে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা থাকে।

টেন্ডার পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতির ধরন

ঘুষ আদায়: প্রতিটি কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঠিকাদারদের নিকট থেকে ঘুষ আদায় করে। এছাড়াও ঠিকাদাররা কাজের প্রাথমিক বা আংশিক বিল তোলার ক্ষেত্রে, কাজের মূল বিল তোলার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত কাজের ভুয়া বিল উত্তোলনের ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং বিলের ওপর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণের ক্ষেত্রে সিলেট 'র‌্যাক' অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ বা বকশিস প্রদান করে। পাউবো-সুনামগঞ্জ এর

[৬] টেন্ডার পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই সর্বনিম্ন দরদাতার মূল্য প্রাক্কলিত বাজেট থেকে বিয়োগ করে শতকরা হারে পরিবর্তিত করে 'লেস' বের করা হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুপাতিক হারে ঘুষ না দিলে বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ না করলে ঠিকাদারদের বিল আটকে দেয়ার এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে।

ওভার এস্টিমেশন: দরপত্র আহ্বানের সময় পাউবো-সুনামগঞ্জ প্রধানত মাপ ও নির্মাণ উপকরণের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ওভার এস্টিমেশন' করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ উপকরণের প্রায় ২৫০-৪০০ শতাংশ পর্যন্ত 'ওভার এস্টিমেশন' করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাঁধের কাজে ব্যবহৃত মাটির ক্ষেত্রে দরপত্রে প্রতি হাজার ঘনফুট মাটির দাম উল্লেখ করা হয়েছিল ৪,০০০-৪,৫০০ টাকা। অথচ স্থানীয়ভাবে সে সময় প্রতি হাজার ঘনফুট মাটির প্রকৃত দাম ছিল ১,০০০-১,২০০ টাকা। এছাড়াও দরপত্রে একখণ্ড বাঁশের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩০ টাকা অথচ এর বাজার মূল্য ছিল ৪০-৫০ টাকা।

'ভেরিয়েশন' বা 'ইমার্জেন্সি' কাজে দুর্নীতি: অনেক সময় পাহাড়ী ঢলের কারণে নতুন কিংবা পুরাতন বাঁধ হুমকির সম্মুখীন হয়। তখন জরুরি ভিত্তিতে বাঁধের দুর্বল অংশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোনো কোনো সময় নকশার অতিরিক্ত কাজ ঠিকাদারদের করতে হয় যা 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয় যেমন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে এবং ঘুষের বিনিময়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক ভেরিয়েশন ওয়ার্ক এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঠিকাদারদের সাথে সমঝোতা অনুযায়ী কাজের মূল্য নির্ধারণ, কাজ না করেও ঠিকাদাররা পাউবো-সুনামগঞ্জ এর একশ্রেণীর কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বিল উত্তোলন এবং তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন।

দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করা: বাঁধের কাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্রে উল্লেখিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করেও বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে পুরো বিল তুলে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন, দরপত্রে উল্লেখ থাকার পরও বাঁধে দুরমুজ করা হয়না, বাঁধে প্রয়োজনীয় ঘাসের আচ্ছাদন দেওয়া হয় না এবং বাঁধে বাঁশের শেল্টার দেওয়া হয় না।

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে বিল উত্তোলন: হাওরে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরো কাজ সমাপ্ত না করেও ঠিকাদাররা পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশের মাধ্যমে বিল তুলে নিয়েছেন। তবে এ ধরনের দুর্নীতি 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' এর ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারা ঠিকাদারদেরকে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের দুর্নীতি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে অসমাপ্ত কাজের অর্থমূল্য পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং ঠিকাদারদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' হয়েছিল এবং এ সকল কাজের বিল একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের মাঝে সমান অনুপাতে ভাগে হয় বলে তথ্যদাতাদের নিকট থেকে জানা যায়[৭]।

পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে দুর্নীতি: পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বাঁধ নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ ও তদারকির সময় বিভিন্ন অজুহাতে প্রায় প্রতিটি ঠিকাদার বা পিআইসি'র নিকট থেকে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প স্থলে যাতায়াত খরচ বাবদ অর্থ দাবী, ঠিকাদারদের নিকট থেকে ঘুষ নিয়ে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে মনগড়া তথ্য সংযোজনের অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার ঠিকাদারদের কেউ যদি ঘুষ দিতে অসম্মতি জানায়, তবে তাদের বিল আটকানোর হুমকিও প্রদান করা হয়।

স্বজনপ্রীতি: পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। নিজেদের পরিচিত ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দিতে দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গোপনীয় তথ্য পাচার, বাঁধ নির্মাণে বিভিন্ন অনিয়ম সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পরিচিতি বা আত্মীয়তা থাকায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা অন্যতম। এরূপ স্বজনপ্রীতির জন্য অনেকক্ষেত্রেই দরপত্র প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

ঠিকাদারদের অনিয়ম ও দুর্নীতি: পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো ঠিকাদাররাও বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কারের কাজে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করে থাকে। এক্ষেত্রে দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করা, টেন্ডারে বর্ণিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা, অতিরিক্ত লাভের আশায় কাজের ব্যাপ্তি কমিয়ে দেওয়া, পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সম্পূর্ণ কাজ না করেও পুরো বিল উত্তোলন করা, কাজ পাওয়ার পর নিয়ম বহির্ভূতভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেওয়া, দরপত্রের সাথে ভুয়া কাগজপত্র (যেমন, অভিজ্ঞতার সনদপত্র) সংযুক্ত করা, বাঁধ নির্মাণের পূর্বে বাঁধের ঘাস না কাটা এবং বাঁধ নির্মাণের পরে সেখানে ঘাস না লাগানো এবং বাঁধে দুরমুজ ব্যবহার না করা উল্লেখযোগ্য।

পিআইসি পদ্ধতিতে দুর্নীতির ধরন

বাঁধ নির্মাণে পিআইসি পদ্ধতিতেও কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

[৭] পাউবো-সুনামগঞ্জ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘুষ আদান-প্রদান: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র সদস্য ও পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ আদান-প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। তবে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে না হলেও বিভিন্ন সময়ে বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিআইসি কর্তৃক পাউবো-সুনামগঞ্জ এর কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

কমিটির সদস্যদের প্রকৃত বরাদ্দ এবং ব্যয় সম্পর্কে অবহিত না করা: 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বিদ্যমান প্রধান সমস্যা হলো, কমিটির সভাপতি কর্তৃক ডুবো বাঁধ নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়াতে প্রভাব বিস্তার করা। সাধারণত জনপ্রতিনিধিরা বাস্তবায়নের কাজে সরাসরি জড়িত থাকায় তারা কাজের প্রকৃত বরাদ্দ, ব্যয় এবং ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদেরকে (যেমন, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নারী সদস্য) অবহিত করে না।

স্থানীয় জনগণকে কাজের প্রকৃতি ও ব্যয় সম্পর্কে অবহিত না করা: পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় জনগণকে কাজের ব্যাপ্তি, ব্যয় এবং ফলাফল সম্পর্কে অভিহিত করা হয় না। স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা গেছে, টেন্ডার পদ্ধতি ছাড়াও দুটি বছর যে পিআইসি পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁধের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

এছাড়াও পিআইসি পদ্ধতিতে নতুন সুবিধাভোগী এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগী তৈরি হয়েছে যা বাঁধ নির্মাণ কাজকে বাধাগ্রস্ত করছে।

স্থানীয় প্রেক্ষাপটে 'পিপিআর'-এর কার্যকরতা:

২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় খসড়া পিপিআর প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে গণখাতে ক্রয় করা হয়। কিন্তু পিপিআর-এর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। পিপিআর-এর নিবলিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে।

- **অনিয়ন্ত্রিত লেস:** পিপিআর অনুযায়ী সকল শর্তাবলী পূরণ হলে, প্রাক্কলিত অর্থের সর্বোচ্চ 'লেস' প্রদানকারী ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণের দরপত্রে প্রাক্কলিত বাজেটের ৭২% পর্যন্ত 'লেস' দিয়ে ঠিকাদাররা কাজ পেয়েছে[৮]। এখানে সহজেই অনুমেয় যে দরপত্রে উল্লেখিত উপকরণের প্রাক্কলিত দরে বাস্তবতার প্রতিফলন থাকে না অর্থাৎ কয়েকগুণ বেশি ওভার এস্টিমেশন করা থাকে।
- **দীর্ঘ প্রক্রিয়া:** পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, একটি কাজের প্রয়োজন যাচাই থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় ৭ মাসের অধিক সময়ও ব্যয় হয়। ফলে দেখা যায় কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই অকাল বন্যায় হাওরের ফসলহানি ঘটে।

বাঁধ নির্মাণে ভৌগোলিক বাস্তবতা বিচার না করা:

- এলাকার ভৌগোলিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকায় বাঁধ নির্মাণে হাওরের পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বলে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
- অপরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণ করে নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টিসহ বাঁধ নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান ক্ষেত্রবিশেষে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সরকারি নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সমন্বয়হীনতার অভাবকে দায়ী করেছেন।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

হাওরবাসীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে হাওর অঞ্চলসমূহের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। গবেষণা ফলাফল ও সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

<u>পাউবো-সুনামগঞ্জ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুপারিশ</u>

১. ডুবো বাঁধের স্থান নির্ধারণ ও ডুবো বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
২. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, বাজেট প্রাক্কলন এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিবীক্ষণ সম্পর্কে এলাকার মানুষকে অবহিত করতে হবে।
৩. বাঁধের নকশা, নির্মাণ কাল, নির্মাণ স্থান, নির্মাণ ব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ সোশ্যাল অডিট (সামাজিক নিরীক্ষা) ও বাজেট ট্র্যাকিং (বাজেট পর্যবেক্ষণ) করে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[৮] দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের সাথে সাক্ষাৎকার এবং এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য যা পরবর্তীতে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত দরপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

৪. প্রতিটি টেন্ডার প্রদানের পূর্বে সততা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের সাথে পাউবো-সুনামগঞ্জ 'সততার অঙ্গিকার/চুক্তি' সম্পাদন ও তা কার্যকর করবে।

৫. পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং ঠিকাদার বাঁধের ঢাল এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘাস এবং উপযুক্ত গাছের আচ্ছাদন সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁধের মাটির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করবে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন প্রতিটি কাজ সম্পর্কে তথ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নাম নির্ধারিত প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বিলবোর্ডে স্থাপন করতে হবে।

৭. নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু এবং শেষ করার লক্ষ্যে পাউবো- সুনামগঞ্জ'কে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

৮. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রাক্কলন, বাঁধ নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পাউবো-ঢাকার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সুপারিশ

৯. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনোরূপ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে অনুসন্ধান সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আর্থিক জরিমানা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে ভালো কাজের জন্য তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।

১০. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর সরকারের নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। তাদের আয়ের বৈধ উৎসের সাথে সম্পত্তির অসংগতি প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে হবে।

১১. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রস্তুত করতে হবে।

১২. হাওর এলাকায় ডুবো বাঁধ নির্মাণের বাস্তবতায় 'পিআইসি' পদ্ধতিকে বিবেচনা করতে হবে এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে।

১৩. ওভার এস্টিমেশন রোধকল্পে এলাকাভিত্তিক বাজারদর বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করতে হবে। এক্ষেত্রে ৫%-১০% কম-বেশির সুযোগ রাখা যেতে পারে।

১৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিয়মিত টেকনিক্যাল/ফিজিক্যাল অডিট করতে হবে।

১৫. হাওর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আন্তঃহাওর পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর সহায়তায় হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে অতি দ্রুত জনগণ এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।

১৭. হাওরের প্রকৃতি-পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় এ অঞ্চলকে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা করে সমন্বিত এবং *'হাওর বান্ধব'* নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৮. হাওর এলাকায় অতি বা অকাল বন্যা হতে সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অতি দ্রুত সুরমা নদীর উৎসমুখে ড্রেজিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমন্বিত এবং সুষ্ঠুভাবে উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাঁধ নির্মাণে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ জুড়েই হাওর-জলাভূমি। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া-এই সাতটি জেলায় ৪৮টি বড় হাওরসহ মোট ৪২৭টি হাওরভূমি আমাদের দেশের জাতীয় উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (মেহেদী, ২০০৫)। বর্ষাকালে এই হাওর ও জলাভূমিগুলো প্রায় ২৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। হাওর জলাশয়ের ১০,১০৮টি জলমহাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 'ভূমি মন্ত্রণালয়ে'র উপর ন্যাস্ত। এছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডসমূহ এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে হাওরভূমি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলাফলস্বরূপ গরীব-অভাবী হাওরবাসীদের কাছ থেকে হাওর কেড়ে নিয়ে ধণী-প্রভাবশালী-অ'হাওরবাসীদের কাছে ইজারা দিয়ে দেয় (মেহেদী, ২০০৫)। হাওর এবং হাওরের ফসল রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং কিছু এনজিও তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও হাওরের ফসল রক্ষার বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের একক কর্তৃত্ব বর্তমানে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে'র উপর ন্যাস্ত। সুনামগঞ্জের বেশ কিছু হাওর (যেমনঃ হাইল হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর প্রভৃতি) দেখা শুনা করার দায়িত্ব জাতীয় এবং আন্ত র্জাতিক কয়েকটি সংস্থার উপর থাকলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)' এর উপর।

১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট

নানান দুর্যোগ ও দুঃশাসন মোকাবেলার ভেতর দিয়েই এগিয়েছে আমাদের দেশের প্রান্তিক মানুষের জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাস। এ দেশে অকাল বন্যা এবং জাতীয় দুর্যোগের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী ১৫শ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল দেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা। পরবর্তী সময়ের বন্যাগুলোর ব্যাপকতাও ছিল বড় এবং ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংরাদেশে চার ধরনের[১] বন্যার ভেতর হাওর এলাকার জন্য বর্তমানে অকাল বা হঠাৎ পাহাড়ি ঢলের বন্যাকেই (Flash Flood) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় (আলী, হক ও সেলিম, ১৯৯৮)। তবে এলাকার প্রতিবেশে কি এমন পরিবর্তন ঘটেছে, অবকাঠামোগত কি পরিবর্তন ঘটেছে কিংবা এক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীক নীতি ও সমন্বিত উদ্যেগগুলো কি হতে পারে তা কখনোই বাংলাদেশের বন্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হতে দেখা যায়নি। দেশের হাওর এলাকার মানুষেরাই সরাসরি এই পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট অকাল বন্যার দূর্ভোগ পোহানো মানুষ। বন্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী অবকাঠামোগত, প্রতিবেশগত ও উন্নয়ননীতিগত বিষয়কে ব্যাখ্যা করে বিষয়টিকে আন্তঃরাষ্ট্রীক জায়গা থেকে ভাববার পাটাতন মেলে দিলেন। ভূ-প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনশীলতা, রাসায়নিক কৃষির প্রসার, মাত্রাতিরিক্ত বিল সেঁচা, স্থানীয় কৃষি ও প্রাণ-বৈচিত্র্যকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচনা না করা, ঐতিহ্যবাহী হাওর সংরক্ষণ জ্ঞান এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকান্ড, হাওর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ কর্মসূচী, অপরিকল্পিত নদী শাসন, প্রতিবেশ ও জীবন বিরোধী নানান জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক আইন ও চুক্তি, টিপাইমূখী বাঁধ ও ভারতের প্রস্তাবিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকার পরিবেশগত বিপর্যয়-সবকিছু মিলিয়ে হাওর তার পূর্বে স্বপ্রতিবেশ এবং পরিবেশ বিরাজিত নেই।

হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণ বহুকাল আগে ধরেই চলে আসছে। আগেরকার দিনে জমিদাররা স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে বাঁধ নির্মাণ করতেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৬৬ সাল থেকে ৪৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছে বলে পাউবো'র বিভিন্ন দলিল থেকে জানা যায়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবী-এর ফলে প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে। তবে বাঁধগুলো জন মানুষের জীবনে কতটা সুফল বয়ে আনতে পেড়েছে তা আজ ভাববার বিষয়। বাঁধের কারণে যেসব খাল হাওরের বিলগুলোকে নদীর সাথে যুক্ত করতো সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আবার খালের মুখে অনেক ক্ষেত্রেই স্লুইচ গেইট নির্মাণ করার ফলে খালগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই অপরিকল্পিত নির্মাণের ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও লালন ভুমিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বলে পরিবেশবিদগণ মনে করেন। ব্যাপক আকারে বোরো ধান চাষ করার কারণে হাওরের পানি পাম্পের সাহায্যে বোরো ক্ষেতে ব্যবহার করা হয়। যা হাওরের বিলগুলোর বেশিরভাগই শীতকালে শুকিয়ে যায়। ফলে জলজ প্রাণবৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী করছে। কৃষি কাজের সাথে সাথে নির্বিচারে মৎস্য নিধন, বিল শুকিয়ে মাছ ধরাও হাওরের পরিবেশতাত্তিক পরিবর্তণ ঘটিয়েছে। বন্যা

---

[১] যথা: River Flooding, Flash Flooding, Tidal Flooding or Storm Surge Flooding, Urban Flooding. এর মধ্যে নদীবিদৌত বন্যা বা River Flooding বাংলাদেশের প্রতিবছর পরিলিক্ষিত হলেও জলোচ্ছ্বাস বা Tidal Flooding or Storm Surge Flooding এর ক্ষেত্রে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রতি চার বছর পর পর এ ধরনের বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নগরের স্যুয়োরেজের লাইন আটকিয়ে যে ধরনের বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে Urban Flooding বলা হয়। আর অকাল বন্যা বা Flash Flooding সাধারণত বর্ষার শুরুতে পাহাড়ি ঢলের ফলে সৃষ্টি হয়।

নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও স্লুইস গেইটের ফলে পলি পড়ার হার বেশি হওয়াতে হাওরের বিলগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এমন অনেক হাওর রয়েছে যেগুলোকে এখন আর হাওর বলা যায় না। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধুমাত্র তাহিরপুর উপজেলায় ২০ একরের নীচে ৪৭ টি বিলের ২১টিই পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে।[২]

১.৩ বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও জলাভূমি

বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু *ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' (বাপাউবো)* 'পূর্ব পাকিস্থান পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের' অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের এই বিভাগটি দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং কৃষির উন্নয়নে সেঁচ কার্যক্রম এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, খাল খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে **১৯৭২** সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পানি এবং বিদ্যুৎ আলাদা দুটি বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। *'পানি উন্নয়ন বোর্ডের'* প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে-দেশের পানি সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প তৈরী, প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পরিচালনা করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলা এবং উপজেলায় তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা অফিস স্থাপন করে। এই অফিসগুলোর মূল দায়িত্ব হলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং তদারকী করা। পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেখানে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন সে ধরনের পদক্ষেপগুলো নিয়ে থাকে জোনাল বা সাব অফিসগুলো। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের হাওর জেলা হিসেবে পরিচিত সুনামগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ অফিস তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। পাউবো-সুনামগঞ্জের অন্যতম দায়িত্ব হলো সরকার কর্তৃক গৃহীত হাওর রক্ষার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমগুলোর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান করা।

১.৪ হাওর, বাওর ও বিল

হাওর একটি স্বতন্ত্র ধরনের নীচু এলাকা বা জলাভূমি। হাওর হলোঃ কম বা বেশি গোলাকার নীচু ভূমি যার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশণযোগ্য অববাহিকা রয়েছে এবং এই গোলাকার নীচু ভূমি নদী দ্বারা চারদিকে ঘেরা থাকে। শুষ্ক হাওরের নিম্নতম অংশে এক বা একাধিক বিল থাকে। বিলগুলো খালের মাধ্যমে নদীর সাথে যুক্ত থাকে। বস্তুতঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহের (নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ) পূর্বাঞ্চল ও বৃহত্তর সিলেটের পশ্চিমাংশকে হাওর অঞ্চল বলা হয়ে থাকে। ধারনা করা হয় **১৭৮৭** সালের প্রলয়ংকারী বন্যা ও ভুমিকম্পের পর বক্ষপুত্র নদের গতি পরিবর্তণ এবং মেঘালয় রাজ্য সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা বরাবর 'ডাউকি চ্যুতি'র কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই হাওর জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। হাওরাঞ্চলগুলো আশপাশের স্থলভাগ থেকে নীচু হয়। বর্ষাকালে হাওর এলাকাগুলো **১০-১৫** ফুট গভীর পানির নীচে চলে যায়। হাওরগুলোর গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ মিটার থেকে ৪ মিটার। তবে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলার কিছু সংখ্যক হাওরের গড় উচ্চতা **১.৫০** মিটার থেকে ২ মিটার।

হাওর অঞ্চলকে ট্রে বা গামলার সাথে তুলনা করা যায়। এই অঞ্চলের চারদিকের স্থলভাগ গামলার উচু প্রান্ত এবং হাওর এলাকা গর্ত। পশ্চিম সীমানা কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা, উত্তরের সীমানা ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল, পূর্বে সীমানা বৃহত্তর সিলেটের উঁচু অঞ্চল এবং দক্ষিণে কুমিল্লা ও ভৈরবের উঁচু অঞ্চল। বর্ষাকালে আশে-পাশের উঁচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার অনেক আগেই হাওর এলাকা পানির নীচে চলে যায়। এই অঞ্চলে সাধারণতঃ দু'বার বন্যা হয়। একবার এপ্রিলের প্রথম দিক হতে জুন মাসের মধ্যে। তখন বন্যার পানিতে হাওর এলাকার বোরো ধান ডুবে যায়। আরেকবার বর্ষার সময়ের ফি বছরের নিয়মিত বন্যা। এই বর্ষা প্রায় আশ্বিণ-কার্তিক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বর্ষাকালে হাওর এলাকা বিশাল সাগরের রূপ নেয়। তখন পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের শত শত বর্গমাইল এলাকা পানিতে একাকার হয়ে যায়। এ সময় হাওর, নদী, আর বিলের কোন অস্তিত্বই বিদ্যমান থাকে না, শুধু পানি আর পানি। একদিকে পানির বিস্তৃতি আরেক দিকে ঢেউয়ের আকার বর্ষাকালে সত্যিই এই অঞ্চলকে সাগরে পরিণত করে। ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন 'সাগর' হতে 'হাওর' শব্দের উৎপত্তি। সাগর শব্দ বিকৃত হয়ে প্রথমে 'সায়র' এবং পড়ে 'হাওর'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

[২] তথ্যসূত্রঃ ২০ একরের নীচে জলমহালের তালিকা, তাহিরপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ।

হাওর, বাওর ও বিল

__হাওর:__ সাধারণত: থালা আকৃতির বন্যা বিদৌত জলাভূমিকে হাওর বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২৫ শতাংশ জুড়ে এই হাওর ভূমি দেখা যায়। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মোট ৪২৭টি হাওর বিস্তৃত। বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ এবং প্রায় ১৪০ প্রজাতির মাছের বিশাল আবাসস্থলএই হাওরগুলো। এছাড়াও প্রতিবছর প্রায় ৮০০০০ হাজার অতিথি পাখির বিচরণ ক্ষেত্র এই হাওর অঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হাওর এলাকায় প্রতিবছর অকাল বন্যা দেখা দেয়।

(তথ্যসূত্র: www.bwdb.gov.bd/haor.htm, তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০০৯)

__বাওর:__ বন্যা প্রবণ নদীগুলোর বিভিন্ন অংশে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির এইসব বাওর তৈরী হয় যাকে অশ্ব ক্ষুরাকৃতির হ্রদও বলা হয়। সাধারণত: বন্যা প্রবল ঐসব নদীতে কালক্রমে পলি জমে একসময় গতিপথ পরিবর্তীত হলেও কিছু অংশ পূর্বের অবস্থায় থেকে যায়। এই পরিবর্তীত অংশগুলোকেই হাওরের সাথে জুড়ে বাওর নামে অভিহিত করা হয়। বাওরকে স্থানীয় ভাষায় বিল, ঝিল প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বাওরগুলো জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর টিকে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুকনো মৌসুমে জলজ প্রাণীগুলো বাওরে এসে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে জলজ ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(তথ্যসূত্র: www.bwdb.gov.bd/baor.htm, তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০০৯)

__বিল:__ বিস্তৃর্ন এলাকা জুড়ে আবদ্ধ পানির অবস্থানকে বিল বলা হয়ে থাকে। বিলগুলো ভূ-উপরিস্থ পানির সবচেয়ে বড় আধার যা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট খালের মাধ্যমে নদীর সাথে কিংবা একটির সাথে আরেকটি যুক্ত থাকে। এ ধরনের বিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় দেখা যায়, বিশেষ করে কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা এবং পাবনা জেলায় সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত: হাওরের তলার অংশে এসব বিল অবস্থিত। বিলগুলো বাংলাদেশে সহজ সেঁচ ব্যবস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(তথ্যসূত্র: www.bwdb.gov.bd/beel.htm, তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০০৯)

১.৫ হাওর ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জলাভূমি মৃত্তিকাকে প্রধানত জৈব মাটি ও খনিজ মাটি এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বাংলাদেশে জৈব মাটি প্রায় ৭৪,০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং সমস্ত নিচু অববাহিকাগুলোতে এটি রয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জ-খুলনা অববাহিকা জৈব মাটির বিস্তৃতির শীর্ষে রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জলাভূমির আওতায় মোট সত্তর থেকে আশির হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত-যা দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় অর্ধেক। বিভিন্ন শ্রেণীর জলাভূমির এলাকাগত বিস্তৃতি নীচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম জলাভূমি এবং তাদের আয়তন।

বিভিন্ন জলাভূমি		আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
উন্মুক্ত জলরাশি	নদ-নদী	৭,৪৯৭
	খাড়িসমূহ ও স্রোতজ গরান জলমগ্নভূমি	৬,১০২
	বিল ও হাওর	১,১৪২
	বন্যা প্লাবিত প্লাবন ভূমি	৫৪,৮৬৬
	কাপ্তাই লেক	৬৮৮
আবদ্ধ জলরাশি	পুকুর	১,৪৬৯
	বাঁওর (অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ)	৫৫
	লবণাক্ত স্বাদু জলের খামার	১,০৮০
সর্বোমোট		**৭২,৮৯৯**

তথ্যসূত্র: আকন্দ, ১৯৮৯ এবং খান, ১৯৯৪।[৩]

উপরোল্লেখিত জলাভূমিগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে আরো বেশ কিছু মৌসুমী জলাভূমি রয়েছে। তাছাড়া মানুষের তৈরী জলাভূমির পরিমাণও বাংলাদেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বেশীরভাগ ভূ-তাত্ত্বিকগন মনে করেন, দেশে এবং দেশের বাইরে মানুষের তৈরী বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলেও নগরের আশেপাশের এলাকায় স্থায়ী জলাভূমির সৃষ্টি হয়।

১.৬ হাওরের জেলা সুনামগঞ্জ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশের প্রধান হাওর জেলা হিসেবে সুনামগঞ্জ ব্যাপকভাবে পরিচিত। ১১ টি উপজেলা নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা গঠিত। জেলার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২০,১৩,৭৭৮ জন (বিবিএস, ২০০১)। নিবাঞ্চল, হাওর এবং পাহাড়ের পাদদেশে

[৩] A.W. AKONDA, 'Bangladesh' in DA Scott edt, *A Directory of Asian Wetlands*, IUCN, Switzerland, 1989. M SALAR KHAN *et al* ed, *Wetlands of Bangladesh*, Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, 1994

অবস্থানের কারণে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য এলাকার তুলনায় কম, যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫৮৫ জন। জেলার শিক্ষার হার ২৮ শতাংশ। জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাহিরপুর ও ছাতক উপজেলার কিছু উঁচু টিলা ও উঁচু জমি ব্যতিত সমগ্র এলাকা সমতল ও বিলাঞ্চল এবং মেঘালয় রাজ্যের পাদদেশ ঘিরে উঁচু টিলা, উঁচু ভূমি ও সমতল ভূমি রয়েছে। এই জেলার প্রধান নদী হচ্ছে সুরমা এবং কুশিয়ারা। সুরমা নদী জেলার

হাওরের ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ

পূর্বে হাওর এলাকার ফসল রক্ষার জন্য স্থানীয় জমিদাররা জনগণের সহায়তায় অকাল বন্যার হাত থেকে ফসলহানী ঠেকানো এবং সেঁচ কাজের সুবিধার লক্ষ্যে ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড) অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত সুবিধা সম্বলিত সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় 'ইআইপি (EIP)' এবং 'এসআরপি (SRP)'-এর অধীনে মোট ৪৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর ফলে মোট ২০০০ কিলোমিটার 'ডুবো বাঁধ' নির্মাণ করা হয় যার কারণে মোট ০.২৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আসে।

(তথ্যসূত্র: www.bwdb.gov.bd, তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০০৯)

উত্তর সীমানা দিয়ে পূর্ব দিক হতে প্রভাহিত হয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কুশিয়ারা নদীতে মিশেছে। অপর দিকে কুশিয়ারা নদী জেলার দক্ষিণ সীমানা দিয়ে পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে সুরমা নদীতে মিশেছে। তাছাড়া বহু ছোট ছোট নদী যেমন মহাশিং, খোয়াই, কালনী, সোনাই, পাল্ডার খাল, রক্তি, যাদুকাটা ছাড়াও এবং অনেক খাল ও পাহাড়ি ছড়া ভারতের মেঘালয় রাজ্য হতে উৎপন্ন হয়ে সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীতে মিশেছে। জেলায় ছোট বড় প্রায় ১২৪টি হাওর ও বিল রয়েছে। অধিক সংখ্যক হাওর, খাল, বিল ও নদী থাকায় এখানে রয়েছে মাছের প্রাচুর্য্য। জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাছ আহরণের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া বালি, পাথর, চুনাপাথর ও কয়লা সহজপ্রাপ্য হওয়ায় বহু লোক এগুলো সংগ্রহ ও ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। জেলার ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর তুলনামূলকভাবে নীচে এবং বিভিন্ন জায়গায় মাটির নীচে গ্যাস এবং পাথর বিদ্যমান থাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই কৃষিতে সেঁচের জন্য হাওর-বিল ও নদীর পানিই প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমিকে সেঁচের আওতায় এনে ফসল উৎপন্ন করা হয়।[8]

হাওরের এই বিশাল ভূ-খন্ডকে কাজে লাগিয়ে এবং হাওরের পানি সম্পদকে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে সুনামগঞ্জ জেলার হাওরের বসবাসকারী লোকদের তথাপি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে ১৯৬৬ সালে সুনামগঞ্জ জেলার হাছনপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনমাগঞ্জ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি শাখা অফিস তার কার্যক্রম শুরু করে (সুকান্ত সেন, ২০০৭)। শুরুর দিকে হাওরের ফসল রক্ষা কল্পে সরাসরি কোন কার্যক্রম হাতে না নিলেও এই সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন শহর রক্ষা বাঁধ, পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য 'স্লুইচ গেইট' নির্মাণ, স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজ সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তিতে দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেখা দেয় অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কতগুলো সমন্বিত উদ্যেগ গ্রহন করে। তার মধ্যে হাওরের বিশাল আনাবাদি কিংবা পতিত জমিগুলোকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়া। এর ফলে ঐসব ভূমিকে অকাল বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা এবং জনগণের মধ্যে এর সফলতা সম্পর্কে সম্মোক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে । যার পরিপ্রেক্ষিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ ১৯৯২ সাল থেকে হাওরের ফসল রক্ষার্থে ডুবো বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করে। এর ফলে দেখা যায়, মাত্র কয়েক লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে হাওরের ফসল রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। এর ফলে যে ফলন পাওয়া যায় তা দিয়ে প্রায় পুরো বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১ মাসেরও অধিক সময়ের ধানের ব্যবস্থা করা যায় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২০০৮)। পরবর্তীতে হাওরের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন এনজিও এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা হাওরগুলোর উন্নয়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজস্ব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পূর্বে পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সরকারের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে সরাসরি খোলা দরপত্র (Open Tender) আহ্বানের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ করার অনুমতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু সাফল্য যাই হোক, পরবর্তিতে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জও হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় জড়িত হয়ে পড়ে। একদা সুনাম অর্জণকারী সরকারি এই সংস্থাটির প্রায় প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি এবং সুশাসনের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দিন দিন স্থানীয় জনগণের আস্থা হারাচ্ছে।

[8] কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা

টিআইবি'র মেকিং ওয়েভস প্রকল্পে সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান যাচাই, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকোপ প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে এবং তরিৎ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনে বেশ কিছু অনুসন্ধানমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি বা খাতটিকে আরো কার্যকর করা। টিআইবি বিশ্বাস করে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সুষম সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে টিআইবি'র সুনামগঞ্জ সনাকের সহায়তায় পাউবো-সুনামগঞ্জের উপর একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

'পাউবো-সুনামগঞ্জ' সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। যার প্রধান কার্যক্রম হলোঃ পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী এবং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহনের ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বারান্বিত করতে সরকারকে সহযোগীতা করা। পাউবো-সুনামগঞ্জের মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ হাওরের ফসল রক্ষার্থে বাঁধ নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ এবং সংস্কার করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বন্যা এবং শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্লুইচ গেইট নির্মাণসহ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন এবং তদারকি করা। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা গেছে পাউবো-সুনামগঞ্জ তার পুরনো ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতির মাধ্যমে সরকার তথা জনগণের কোটি কোটি টাকা যেমন নষ্ট করছে তেমনি হুমকীর সম্মুখীন করছে হাওরের ফসল তথা হাওরবাসী মানুষ ও জীব-বৈচিত্র্যকে। তাই পাউবো-সুনামগঞ্জকে কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে রূপদানকল্পে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। এছাড়া আরো বেশ কিছু কারণে পাউবো-সুনামগঞ্জের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার যৌক্তিকতা খূজে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-

- বিভিন্ন সরকারি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুষ্ঠভাবে হাওর এলাকার ধান তুলতে পারলে সে ধান দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় এক মাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে হাওর রক্ষা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে;
- হাওর এলাকার জনগণ হাওরের ফসল এবং মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই হাওরের ফসল এবং মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হিসেবে হাওর এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকান্ডগুলোর মূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে;
- হাওর এলাকার প্রান্তিক জনগণ বছরের একটা সময় বেকার বসে থাকে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে;
- হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জের বড় ভুমিকা রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ডের মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ, টিআইবি এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এনজিও এবং সরকারি অফিসগুলো মনে করে।

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণাকর্মটি যে প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পাদিত হয়েছিল তা হলোঃ হাওরে বাঁধ নির্মাণে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের ভূমিকা মূল্যায়ন করা এবং গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এছাড়াও গবেষণাটি কিছু সুনর্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পাদিত হয়েছিল। সেগুলো হলো -

- হাওরে ডুবো বাঁধ নির্মাণে পানি উনড়বয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মূল্যায়ন;
- বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করা;
- হাওরের বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা; এবং
- বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদানসহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনে একটি 'পলিসি ব্রীফ' তৈরী করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা।

১.৯ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার সময় যে পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকা নির্বাচন করে নমুনা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ ও তার মান নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বশেষে তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো।

১.৯.১ *গবেষণা এপ্রোচ*

গবেষণার উদ্দেশ্য এবং হাওর বাস্তবতায় Holistic Approach (সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি)-কে গবেষণার প্রধান এপ্রোচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ প্রতিটি ক্রিয়াই একটির সাথে আরেকটি পাস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এছাড়াও গবেষণায় তথ্যের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৯.২ *তথ্যের উৎস*

গবেষণায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উৎসগুলো হলোঃ

- ***তথ্যের পরোক্ষ উৎস :*** প্রাসঙ্গিক গবেষণা তথ্য পর্যালোচণা যেমনঃ বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হাওর এলাকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদন, পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত্ব বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় কাজ করে (যেমনঃ বারসিক, কেয়ার এবং জাতীসংঘের আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থাসহ অন্যান্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা) এমন বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন, বিভিন্ন সময়ে হাওর রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ কর্তৃক সরকারের কাছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রেরণকৃত প্রেস রিলিজ এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

- ***তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস :*** গবেষণায় প্রত্যক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনস (এফজিডি), দলীয় আলোচনা এবং মূখ্য তথদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। গবেষণায় হাওর সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্টদের এই মূখ্য দল আলোচনা, দলীয় আলোচনা ও মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে অন্ত র্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ছিলেন তেমনি বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, সাব-ঠিকাদারসহ স্থানীয় কৃষকদেরকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। নীচের সারণি-২ এ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের উৎসের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারণি-২: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের উৎস

পরিমাণবাচক পদ্ধতি		গুণবাচক পদ্ধতি	
প্রত্যক্ষ উৎস	পরোক্ষ উৎস	প্রত্যক্ষ উৎস	পরোক্ষ উৎস
▪ দরপত্র ▪ টাইম সিডিউল	▪ বাজেট ▪ বিবিএস, পাউবো, কৃষি অধিদপ্তরসহ আরো বেশ কিছু সরকারি বেসকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত। ▪ ওয়েবসাইট	▪ এফজিডি ▪ মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ▪ কেস স্টাডি ▪ নিবিড় পর্যবেক্ষণ	▪ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট ▪ গবেষণা গ্রন্থ ▪ সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিসমূহ ▪ ওয়েবসাইট

১.৯.৩ *উত্তরদাতা নির্বাচন*

নির্বাচিত এলাকাগুলোতে বসবাসকারী ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, উত্তরদানে সক্ষম এবং হাওর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের উত্তরদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সুনামগঞ্জ সদরসহ ঢাকায় হাওর উন্নয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকেও সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৯.৪ *তথ্য-উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ*

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তি ও সেই সব তথ্য যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ এবং সংগ্রহীত উত্তরপত্র ক্রস চেকের (Cross Check) মাধ্যমে এর পরিপূর্ণতা দেয়া হয়। পরবর্তিতে প্রতিটি তথ্য-উপাত্তকে কয়েকটি পর্যায় থেকে চেক (Check), পূনঃচেক (Re-Check) করে গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

১.৯.৫ *গবেষণার সময়কাল*

গবেষণার সময়কাল ছিল অক্টোবর ২০০৮ থেকে জুন' ২০০৯ পর্যন্ত। তন্মধ্যে নভেম্বর' ২০০৮ থেকে ফেব্রুয়ারী' ২০০৯ পর্যন্ত গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.১০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটি সম্পাদন করতে গিয়ে গবেষণাদল বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় পড়েছিল। এর কোনটি হয়েছিল স্থানীয় প্রশাসনের কারণে আবার কোনটি হয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অসহযোগীতামূলক আচরণের কারণে। নিম্নে গবেষণা দলের গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে যে সকল সমস্যায় পড়েছিল তা উল্লেখ করা হলো:

- তথ্য-উপাত্ত যেমনঃ গবেষণা সম্পর্কিত বই, জার্নাল, প্রবন্ধ এবং সরকারি তথ্যের পরিমাণের স্বল্পতা ছিল গবেষণার প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া বাঁধ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন ধরনের একক গবেষণা না হওয়ায় গবেষণার শুরুতে দিক নির্দেশনা পেতে বেগ পেতে হয়;
- সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সহযোগীতামূলক আচরণের অভাব লক্ষ্যনীয় । তন্মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে বিলম্ব, সংগ্রহে নেই কিংবা বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে বলে সরবরাহে অনিহা প্রকাশ উল্লেখযোগ্য;
- সনাক এলাকা থেকে হাওর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় গবেষণার কাজে মাঝে মাঝেই বিঘ্ন ঘটে। এছাড়াও রয়েছে যানবাহনের অপ্রতুলতা এবং ক্লান্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণ;
- হাওরবাসী ও সুশীল সমাজের লোকজন টিআইবি'র এ উদ্যেগকে স্বাগত জানালেও ঠিকাদার এবং দালালদের অসহযোগীতামূলক আচরণ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় বিঘ্ন ঘটেছিল এবং ঐসব এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা দূঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল;
- *'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'* কর্তৃক অসহযোগীতা। বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করেও প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে দেখা করতে না পারা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য;

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর পরও গবেষণাদলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সুনামগঞ্জ সনাক সদস্যদের সহযোগীতায় সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

১.১১ প্রতিবেদন কাঠামো

পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের উপর পরিচালিত তথ্যানুসন্ধানমূলক গবেষণার মোট ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাথমিক ধারণা, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাওর জেলা সুনামগঞ্জের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং হাওরে অপরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ফলে আর্থ-সামাজিক লাভ-ক্ষতির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ এবং হাওর উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন এবং এর ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ এবং সমস্যাগুলোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট গুরুত্ব এবং বাস্তবতা

নানান মোকাবেলার ভেতর দিয়েই এগিয়েছে আমাদের দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। এ দেশে বন্যার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী, ১৫শ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের বন্যাগুলোর ব্যাপকতাও ছিল বড় এবং ভয়াবহ। হাওর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব এবং বাস্তবতা বোঝার জন্য এই অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক ফসল বোরো ধান, মৎস্য সম্পদ, পেশা, কৃষি জমির ধরন, বৈচিত্রময় ভৌগলিক বাস্তবতা ও পরিবেশ সবকিছু বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা দীর্ঘদিন এই বাস্তবতার মধ্যে বসবাসের ফলে এর সাথে অধিবাসীদের চৈতন্যগত সম্পর্ক এবং সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই হাওর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব এবং বাস্তবতা বোঝার জন্য এই অধ্যায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

২.১ সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জলবায়ূ

হাওর এলাকা সুনামগঞ্জের প্রধান নদীসমূহ হলো সুরমা[৫] ও কুশিয়ারা। আসামের বরাক উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা নদী সিলেট, ছাতক, দোয়ারা বাজর, সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ, দিরাই, শাল্লা হয়ে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়ে ভৈরবের কাছে মেঘনা নদীতে পড়েছে। সুরমা বাহিত পলি মাটিতে ভাটি এলাকার ব্যাপক অঞ্চল ভরাট হয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টি প্রবণ এলাকা ভারতের চেরাপুঞ্জি সুনামগঞ্জ সীমান্তের খুবই কাছে। চেরাপুঞ্জি থেকে বৃষ্টির পানি পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ছোট ছোট ঝর্ণা ও নদী দিয়ে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে। এই পানির সঙ্গে আসে কোটি কোটি টন পলি মাটি। আর এতেই দিনে দিনে ভাটি এলাকার নদী-নালা, হাওর ভরাট হয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এই কারণে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে জেলার ১৪৫ মাইল নৌ-পথ। আসামের বরাক উপত্যকা থেকে বরাক নদী ২৪.৩μ অক্ষাংশে এবং ৯২.৩২μ দ্রাঘিমাংশে উৎপন্ন হয়ে সিলেটের জকিগঞ্জ এলাকার অমলসীদ নামক স্থানে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে ভাগ হয়ে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ এলাকার মার্কুলী বাজারের কাছে আবার পুনরায় মিলিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরব এবং কুলিয়াচরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। শুকনো মৌসুমে বরাক নদীর ৮৫ ভাগ পানি কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশ শহরের পাহাড়ি এলাকা থেকে জন্ম নিয়ে মনু নদী ভারতীয় অংশের ৯০০ বর্গ মাইল অববাহিকা তৈরী করে সিলেটের গোবিন্দপুর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর সিলেট এলাকাতেও তৈরী করেছে প্রায় ২২০ মাইল অববাহিকা।

এককালে পাহাড় এলাকা থেকে বৃষ্টির পানি নেমে হাওর এলাকায় বর্ষায় তৈরি করতো ঋতু ভিত্তিক বন্যা আর ওই বন্যার সাথে মানুষের এক ধরনের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক ছিল। কখন কোন নদী দিয়ে কোন হাওরে কি মাসে এই পাহাড়ি ঢলের পানি নামবে তার একটা নিয়মরীতি এসব অঞ্চলের মানুষের চেনাজানা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়মরীতি সব ভেঙ্গে গেছে। এখন যখন তখন-যে কোন জায়গা দিয়ে যে কোন হাওরে নামে পাহাড়ি ঢলের পানি। হাওর এলাকায় এই হঠাৎ অকাল বন্যার প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলছে। পাহাড়ি ঢলের এই অকাল বন্যাই আজকের হাওরবাসীর জন্য ডেকে এনেছে সীমাহীন দুর্ভোগ। হাওরবাসীর নতুন এই দুর্ভোগের জন্য স্থানীয় মানুষেরা দায়ী করেন ভারতীয় সীমান্ত এলাকার প্রতিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং আন্ত:রাষ্ট্রীক অব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত নির্মাণকে। ফলাফল স্বরূপ সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট এলাকার হাওরের পানির উৎস সুরমা, কুশিয়ারা, খোয়াই, মনু, কালনি, পিয়াইন নদীসহ এসব নদীর শাখা-প্রশাখাগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে।[৬] ফলে নদীগুলো পানি ধারনক্ষমতা হারাচ্ছে এবং অল্প বর্ষাতেই নদীর পানি আশে-পাশের এলাকাকে প্লাবিত করছে।

হাওর এলাকার মানুষ অকাল বন্যাকে পাহাড়ি ঢল বা 'পাহাড়ি বান' হিসেবেই জানেন এবং এর ফলে হাওর এলাকার দুর্ভোগ দিনে দিনে বেড়েই চলছে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৯৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পরপরই তৎকালীন সরকার এদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের পথ ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য জাতিসংঘের জুলিয়ান ক্রুগ, মিশিসিপি নদীর জেনারেল হার্ডিন, নেদারল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাইসিওকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৫৬ সালে জুলিয়ান ক্রুগ তার প্রতিবেদন পেশ করেন যা *'ক্রুগ মিশন'* নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়।[৭] ১৯৬৩ সালে জেনারেল হার্ডিন এবং ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক থাইসিও তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেন। তিনটি প্রতিবেদনেই এদেশের বন্যা সমস্যাকে পৃথিবীর

---

[৫] কথিত আছে, গৌড়ের রাজা ক্ষেত্রপালের দুই স্ত্রী সুরম্য ও রত্নাবতী। রাজা ক্ষেত্রপাল আসামের বরাক নদী থেকে খাল কেটে আদি সুরমা নদী সৃষ্টি করেন এবং সুরম্যার নামানুসারে নদীর নাম রাখেন সুরমা।

[৬] জুরী নদী ভরাট: বোরো চাষ ব্যাহত হওয়ার আশংকা, সাপ্তাহিক জুরী সংবাদ, জানুয়ারী ০১' ২০০৬।

[৭] নদ - নদী এবং বন্যা, জ্যোর্তিময় বসু, পাক্ষিক চিন্তা: ২১-২২, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬-৩৯।

জটিলতম পরিবেশগত সমস্যাগুলোর একটি বলে উল্লেখ করা হয়। জালের মতো বিস্তৃত শাখা নদীসমূহকে সচল রেখে নদী সংস্কার এবং নদীর তীর বরাবর বাঁধ নির্মাণের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে সম্ভব বলে প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হলেও এর স্থায়ী সমাধান কেউ দিয়ে যেতে পারেননি। যদিও তারা বলেছেন একমাত্র আন্ত:রাষ্ট্রীক পানি নীতি এবং পরিকল্পিত নদী ব্যবস্থাপনাই হতে পারে এ সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

জলবায়ুজনিত পরিবর্তন এবং বর্ষাকালে উজানের স্রোতে পাহাড়ি বালি আসার কারণে নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দাবী করেছেন পাহাড়ি ঢলের সাথে আসা বালির কারণে সুরমার উৎস এলাকায় বিস্তৃত অঞ্চল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মতো হাওর এলাকাও এক সময় মরুভূমিতে পরিণত হবে। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা মণিপুরে নানান অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের কুশিয়ারা-সুরমা-মেঘনা এই প্রধান নদী প্রণালীও আজ হুমকীর মুখে। মৌলভীবাজার জেলার প্রধান নদী মনু নদী প্রতি বছর প্রায় ৪২ লাখ টন পলি মাটি বয়ে নিয়ে আসে এবং মনু নদীর পাহাড়ি ঢলে প্রতি বছর ৫০ হাজার একর এলাকার ফসল কেড়ে নেয় (সিদ্দিকী, ২০০৬)। এছাড়াও ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে বিগত প্রায় ৫০ দশক ধরে পাহাড়ি এলাকায় আবাদ শুরু হওয়ায় ও জনবসতি গড়ে উঠায় মাটি আলগা হয়ে পড়েছে এবং বর্ষা মৌসুমে এ মাটি পলিবাহিত হয়ে নদীগর্ভ ভরাট করে পানি ধারণ ক্ষমতা বিনষ্ট করে দিচ্ছে। এরফলে মৌলভীবাজারের জুড়ী নদী ভরাট হয়ে একদিকে যেমন বৃষ্টি হলেই বা পাহাড়ি ঢল নামলে নদীর দু'কুল উপচে এলাকায় বন্যা দেখা দেয়, তেমনি শীত মৌসুমে নদী শুকিয়ে গিয়ে পানির অভাবে বোরো চাষ ব্যাহত হয়। এছাড়া মনু নদীর আশে-পাশের কয়েকটি অংশে প্রায় ৯০ হাজার একর হাওর এলাকার ফসলী জমিতে পাহাড়ি বালির স্তর পড়ে চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। একইভাবে সুনামগঞ্জ জেলার ৭টি স্রোতস্বিনী নদী এখন মরা নদীতে পরিণত হয়ে প্রায় ৬৬০,০৩৫ হেক্টর এলাকার পানির ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, যার জন্য হাওর এলাকায় বর্ষা শুরু হতে না হতেই দেখা দিচ্ছে অকাল বন্যা। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ায় জেলার প্রায় ২০টি নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে (মেহেদী, ২০০৫)।

২.২ পাহাড়ি ঢল ও অকাল বন্যা

বাংলাদেশের উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড়ভূমি, পূর্বে মণিপুরের পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা বর্ষার জল হাওর এলাকায় *'নলতল বাইরা'* বা সর্বপ্লাবী/সর্বগ্রাসী প্লাবন তৈরী করে। কখনো কখনো বন্যা জলের উচ্চতা ৬ ফুট ছাড়িয়ে যায়। এসময় *'আফাল'* (হাওরের তীব্র ঢেউকে স্থানীয় ভাষায় 'ধাফাল' বলা হয়ে থাকে) বা *'আফরমারা'* (হাওরের প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য বাঁশ এবং খড়কুটো দিয়ে তৈরী আশ্রয়কে স্থানীয় ভাষায় আফর বলে। আর আফরমারা হলো আফর ভেঙ্গে দেওয়ার মতো শক্তিশালী ঢেউ)-র তান্ডবে এলাকাবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। হাওরসমূহের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ৪ মিটার উঁচু হলেও সুনামগঞ্জ এলাকার হাওরসমূহের গড় উচ্চতা ২ মিটার। এ কারণে মেঘালয় ও বরাক উপত্যকায় বৃষ্টিপাত হলে সুনাগঞ্জের হাওরে প্রথমেই গড়িয়ে নামে। ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মাত্র ২০০৩ সালেই একবার বোরো ফসল সুনামগঞ্জের হাওরবাসীরা ঘরে তুলতে পেরেছিলেন। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া মন্ডলে পরিবর্তণ সূচিত হওয়ায় অতিরিক্ত ও আগাম বৃষ্টিপাত হওয়া ও বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারেনা, পাহাড় এলাকার গাছ উজাড়, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে জলস্রোতের সাথে পলি ও বালি নেমে হাওর ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন অকাল বন্যা ও জলাবদ্ধতা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন (মেহেদী, ২০০৫)।

উজানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানি দেশের দীর্ঘতম নদী প্রণালী সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দেশব্যাপী অকাল বন্যার অবস্থা তৈরী করে। অপরিকল্পিত বাঁধ, নদী ভরাট ও দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে দিনকে দিন বন্যার ভয়াবহতা বেড়েই চলছে। সরকারি সূত্র মতে, ২০০৪ সালের বন্যায় ৪৬টি জেলার ৩০০ উপজেলায় ৮ লাখ ৫১ হাজার ১১৪ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৪৮ লাখ ৮৪ হাজার কৃষক পরিবার। যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ২৬ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ জনের মত। ২০০৪ সালের বন্যায় কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যায়। বন্যা পরবর্তী কৃষি পুর্নবাসনে সরকারের পক্ষ থেকে ১৫৮ কোটি টাকার এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তার সুফল হাওরবাসী জনগণ কখনোই দেখেনি।

২.৩ হাওর জেলা সুনামগঞ্জের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা

হাওর অঞ্চলের অনন্য বৈশিষ্ট হলো বছরের একটা সময় এই হাওর পরিণত হয় উর্বর কৃষি ভূমিতে এবং বছরের অন্য একটা সময়ে মৎস্য চাষের অনন্য সম্ভাবনাময় জলাভূমিতে। ফলে হাওর অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বুঝাতে হলে হাওরের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যেকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। হাওর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা অকাল বন্যা এবং এই বন্যা পরিস্থিতির উপর এই অঞ্চল সমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর করে। আশ্বিনের আগাম বন্যা কেমন বিপর্যয় নামিয়ে আনতে পারে

মৈমনসিংহ গীতিকার *'মলুয়া'* পালায় তার বর্ণনা রয়েছে।[৮] এ চিত্রটি শত শত বছরের পুরনো নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ এলাকার হাওরের হলেও এখনও তা অধিকাংশ হাওর এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

হাওর অঞ্চলে উৎপাদিত ফসলের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। এখানে ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল যেমন: আলু, সরিষা, শীতকালীন সব্জি, গ্রীষ্মকালীন সব্জি, ভুট্টা, পাট, চীনাবাদাম, মিষ্টি আলু, আখ, গম, মসলা ও ডাল জাতীয় ফসল। তাই হাওর অঞ্চলের প্রধান ফসল বোরো ধান হলেও অন্যান্য কৃষি পণ্যও এখানে উৎপাদিত হয়। অধিকাংশ হাওরবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও কৃষির সাথে জড়িত। নীচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, সুনামগঞ্জে কৃষির সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে ৬৭.৫৩%, যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়েও বেশী। অন্যান্য জেলার তুলনায় সুনামগঞ্জ জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা তুলানামূলক কম হওয়া সত্ত্বেও এখানে দরিদ্র্য লোকদের সংখ্যা অন্যান্য হাওর জেলার তুলনায় বেশি (বাংলাপিডিয়া, ২০০২)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, সুনামগঞ্জে ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ-যা অন্যান্য জেলার তুলনায় (বিশেষ করে হাওর অধ্যুষিত জেলাগুলোর) কম। এছাড়াও ক্ষুদ্র চাষীদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ, মাঝারি চাষীদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২১ ভাগ এবং ধনী চাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ (বাংলাপিডিয়া, ২০০২)।

২.৩.১ *পেশা*

সুনামগঞ্জ জেলার মোট লোক সংখ্যা ২০,১৩,৭৭৮ জন এবং এদের মধ্যে অকৃষি পেশার সাথে জড়িত সর্বোচ্চ শতকরা প্রায় ৪৩.৪৩ ভাগ। শুধুমাত্র কৃষি পেশার সাথে জড়িত শতকরা প্রায় ৬৭.৫৩ ভাগ জনগণ। পূর্বের তুলনায় মৎস্যজীবির সংখ্যা কমে এখন শতকরা প্রায় ৩.৩৪ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭.৪৪ ভাগ (সারণি-৩)।

সারণি-৩: সুনামগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা এবং তাদের পেশার শতকরা হার

জেলা	লোকসংখ্যা	পেশা				
		কৃষক	কৃষি শ্রমিক	মৎস্যজীবী	ব্যবসায়ী	অন্যান্য
সুনামগঞ্জ	২০,১৩,৭৭৮	৪৩.৪৩%	২৪.১০%	৩.৩৪%	৭.৪৪%	২১.৬৯%

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ -২০০২।

অধিকাংশ হাওরবাসী একটি মাত্র ফসলের উপর নির্ভরশীলতার কারণে এই ফসল কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে শুধুমাত্র ফসল ও কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়না এর সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী, দিনমজুর, বর্গাচাষীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হাওর অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার ভালোমন্দ নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। যে বছর প্রকৃতি অনুকূলে থাকে সে বছর অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপনে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে। আগাম বন্যার কারণে ক্ষতির মাত্রা এতো তীব্র হয় যে, এক বছরের ক্ষতির মাত্রা পরবর্তী বছর কাটিয়ে উঠাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। চৈত্র মাস তথা ধান মাড়াইয়ের ঠিক আগের সময়ে হাওর অঞ্চলে 'অকাল' বা অভাব দেখা যায়। ব্যাংক ঋণে গরীব চাষীদের প্রবেশাধিকার সীমিত বলে মহাজনদের কাছ থেকেই তাদের অধিকহারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। হাওর জেলা সুনামগঞ্জের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধনী কৃষকদের সংখ্যা সুনামগঞ্জ জেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

কেস স্টাডি-১

প্রতিবছর ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নি:স্বতর হচ্ছে গরীব চাষীরা

সাফতারপাড় গ্রামের বাসিন্দা মুজিবুর রহমান কজন কৃষক। ১৯৯৫ সালেও তার ১৪ কেয়ার জমি ছিল। তিনি সুদে টাকা নিয়ে জমিতে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু ফি বছর বাঁধ ভেঙ্গে তাঁর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় সে টাকা আর পরিশোধ করতে পারেনা। তিনি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে আরো ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। পরে বাধ্য হয়ে কিছু জমি বিক্রি করে দেন এবং কিছু জমি বন্ধক রাখেন। তিনি ব্যাংক ঋণের চেষ্টা করে ঘুষের টাকা যোগার করতে পারেননি বলে ঐ জমি আর ফেরত নিতে পারেননি। এতে করে প্রতি বছর ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তিনি একে একে তার সব জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছেন। এখন তিনি বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভূমিহীন কৃষক হওয়ায় এবং জমির কোন দলিল না থাকায় তিনি আর কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারছে না।

সংগ্রহকাল: নভেম্বর ২০০৮

২.৩.২ *কৃষি*

হাওর অঞ্চলের অনন্য ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যই এই অঞ্চলকে কৃষির স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। জমির প্রকৃতি বিবেচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ জমি হচ্ছে এক ফসলি। আবার এই এক ফসলি জমির অধিকাংশই বছরের প্রায় ছয়/সাত মাস

[৮] আশ্বিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান, এরে দেইখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরান, মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়া হাত, সারা বছরের লাইগ্যা গেছে ঘরের ভাত, টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল, কি দিয়া পালিব মা'য় কুলের ছাওয়াল, আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল, পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে দিল।

থাকে পানির নীচে। বাকি সময়ের মধ্যে ধানের চাষাবাদের অধিকাংশ কাজ করতে হয়। তিন ফসলি জমি হাওর অঞ্চলে খুবই কম। নীচের সারণি-৪ থেকে দেখা যায়, সুনামগঞ্জে এক ফসলি জমির পরিমাণ মোট আবাদী জমির অর্ধেকের চেয়েও বেশী।

২.৩.৩ *হাওর অঞ্চলের জমির প্রকৃতি*

বাংলাদেশের হাওর জেলাগুলোর ভূমি প্রকৃতি বিবেচনায় দেখা যায়, বছরের ৬/৭ মাস হাওরগুলো ১০-১৫ ফুট পানির নীচে ডুবে থাক। পরবর্তীতে আক্টোবর-নভেম্বরের দিকে পানি নেমে গিয়ে আবাদী জমি জেগে উঠে। এসময় হাওর এলাকার জনগণ সাধারণত বোরো ফসলের চাষ করে থাকে। এছাড়াও হাওর এলাকার কিছু উঁচু জমি দুই কিংবা তিন ফসলি হিসেবে পরিচিত। তবে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে এখনো হাওর এলাকার বিস্তীর্ণ জমি আনাবাদী রয়ে গেছে।

সারণি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার জমির প্রকৃতি

জেলার নাম	জমির প্রকৃতি			
	আবাদী জমি (%)			অনাবাদী জমি
	এক ফসলি	দুই ফসলি	তিন ফসলি	
সুনামগঞ্জ	২,০৪,৬২৪ হেক্টর			১,৬২,৩৩৪ হেক্টর
	৬৫.৪৯	২৭.০০	৬.৯০	
	২৮.৩৮	৫৩.৯৫	১৭.৬৭	

সূত্র: বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এবং হাওর রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ, সুনামগঞ্জ।

উপরের সারণি-৪ এ দেখা যাচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২,০৪,৬২৪ হেক্টর এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ ১,৬২,৩৩৪ হেক্টর। আবাদী জমির মধ্যে বেশিরভাগ জমিই এক ফসলি যা শতকরা প্রায় ৬৫.৪৯ ভাগ। এছাড়া দুই ফসলি জমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ এবং তিন ফসলি জমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৬.৯০ ভাগ।

২.৩.৪ *হাওর অঞ্চলের উৎপাদিত ফসল*

বিগত কয়েক বছরের আবাদী জমির পরিমাণ বিবেচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী জমিতে বোরো ধান আবাদ করা হয়েছিল। ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ সালে বোরো উফশী ও স্থানীয় জাত মিলে উৎপাদন বিবেচনা করলে দেখা যায় ২০০৭-২০০৮ সালে বোরো উফসি উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৬,০৪,৪৬২.৫ মে: টন, স্থানীয় জাতের উৎপাদন ৭৮,৩৮০ মে: টন, অর্থাৎ বোরো ফসলের মোট উৎপাদন ৬,৮২,৮৪২.৫ মে: টন। ২০০৬-২০০৭ সাল বিবেচনা করলে দেখা যায়, বোরো উফসির ফলন হচ্ছে ৪,৩৮,৭৮৯ মে: টন, বোরো স্থানীয় জাতের উৎপাদন হচ্ছে ৯৩,১৪৭ মে: টন অর্থাৎ বোরো উফশী ও স্থানীয় জাত মিলে বোরোর মোট হচ্ছে ৫,৩১,৯৩৬ মে: টন (সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২০০৯)।[৯]

২.৩.৫ *মৎস্য সম্পদ*

হাওর অঞ্চলের অন্যতম একটি সম্পদ হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতি বছর মাছের উৎপাদন হয় ৩০.৭০৬ মেট্রিক টন, যা এ অঞ্চলের মাছের মোট চাহিদার চেয়েও ৬০,০০০ টন বেশী (মেহেদী, ২০০৫)। তবে যারা সরাসরি হাওর অঞ্চলে মাছের ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের মতে বিগত কয়েক বছরে হাওর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন অনেক হ্রাস পেয়েছে।

সুনামগঞ্জ হাওর অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ

__সবসময় লভ্য:__ চিতল, বোয়াল, রুই, কাতলা, কার্ফু, চেলা, গ্রাসকার্প, মিনারকার্প, সোল, গজার, টাকি, বাইল্লা, ইচা, চান্দা, কটকটি, বাইম, তারাবাইম, পুটি, কাইকা, সুবাল, মেনি, গইন্যা, কাইল্লা, টেংরা, চাটুয়া, খলিশা, কৈ, শিং, মাগুর, দারকিনা, নাপিত, বুইট্টা, পাবদা, রানি, লাসো, মাইট্টাডাঙ্গা, চাপিলা, প্রভৃতি।

__বিলুপ্ত প্রায়:__ ইলিশ, বাচা, শরপুঁটি, গারুয়া, গাং মাগুর, গাং টেংরা, ভাটা, বালি, বাদাপার, ইলং প্রভৃতি।

__বিলুপ্ত:__ মহাশোল, নান্দিত, পিলন, বাঘাইড়, মনাপব, চিপরাফুল, শোর, ঘোড়ামাছ, বাঁশপাতা।

(তথ্যসূত্র: বারসিক- ২০০৬)

এই মৎস্য সম্পদ হাওর এলাকার মানুষের জীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে । কিন্তু বর্তমান সময়ে ইজারা প্রথার কারণে এলাকার সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করে ব্যবসায়ীদের হাতে হাওরগুলোকে তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলে সম্প্রদায়গুলো হাওরে মাছ ধরার কোন সুযোগ পাননা। বিল ইজারার শর্ত মতে ইজারাকৃত বিলের বাইরের তিনশত গজ পর্যন্ত বাইরের লোকের মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ সময় বিলের পানি উক্ত সীমানা ছেড়ে গ্রামবাসীদের জমিতে চলে আসে। ঐ সময় নিজের জমিতে মাছ ধরতে গেলেও ইজারাদারদের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হতে হয় (মেহেদী, ২০০৫)। হরিনগর গ্রামের এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে একই তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায়।

[৯] সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত।

গ্রামবাসীরা বলেন, ইজারাদারদের পাহাড়াদাররা অনেক সময় চাষীদের নিজের জমিতে প্রয়োজনীয় কাজ করতে যেতেও বাধা দেয়। অনেক সময় কোন প্রকার উস্কানী ছাড়াই পাহাড়াদাররা গ্রামে ঢুকে জেলেদের জালসহ মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে যায়।

২.৩.৬ *শিক্ষা*

সুনামগঞ্জ জেলার গড় শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ৩৪.৪ ভাগ (বিবিএস, ২০০১)। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর অক্টোবর' ২০০৪ এর জরিপ অনুযায়ী হাওর অধ্যুষিত সিলেট বিভাগে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর হার দেশের অন্য যে কোনো এলাকার চেয়ে কম। এখানে মাত্র ৪৪.২ শতাংশ শিশু স্কুলের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে। মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে মাত্র ৩৬.১ শতাংশ (মেহেদী, ২০০৫)। সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত প্রতিষ্ঠান 'শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সংসদ' (ক্রিস) এর মতে, ওই জেলার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত না হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ সমূহ হলোঃ এলাকার ভৌগলিক অবস্থা, শিক্ষক/শিক্ষিকা সংকট, শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে প্রার্থীর অপ্রাপ্যতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যা ও বৃষ্টির আধিক্য, শিশুদের পারিবারিক প্রয়োজনে অভিভাবকদের সহায়তা করা, প্রাকৃতিক বাস্তবতা, অভিভাবকদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।[১০]

২.৩.৭ *স্বাস্থ্যচিত্র*

প্রথাগত চিকিৎসার প্রতিই হাওর অঞ্চলের মানুষের এখনও নির্ভরতা বেশী। এর পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব, কুসংস্কারচ্ছন্নতা প্রভৃতি। তাছাড়া চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ও অবকাঠামোগত সমস্যা সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় প্রকট। হাওর জেলা সুনামগঞ্জের চিকিৎসকের সংখ্যা হচ্ছে ৬৫ জন এবং অন্যান্য হাওর জেলার সাথে তুলনা করলে এই ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থান সবচেয়ে নাজুক (পরিশিষ্ট-৪)। বর্ষাকালে হাওর অঞ্চলের স্বাভাবিক চিত্র বদলে যায়। এই সময় বিশুদ্ধ খাবার পানির সঙ্কটের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয় প্রভৃতি পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়। এ সময় ভয়ংকর ঢেউ, ঝড়ো বাতাসের কারণে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পৌছে সেবা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ কবিরাজ, পল্লী চিকিৎসকদের কাছে যেতে বাধ্য হন।

২.৩.৮ *হাওরাঞ্চলের নারী*

হাওরাঞ্চলে নারীরা সাাধারণত গৃহ পরিবেশেই তাদের অধিকাংশ সময় কাটায় এবং গৃহস্থালীর কাজের সাথে যুক্ত থাকেন (মেহেদী, ২০০৫)। তবে অর্থনৈতিক অবস্থানভেদে কিছুটা ভিন্ন চিত্র রয়েছে। কন্যা শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ কম। ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের যে দুটি জেলায় শিশু ঝুঁকির হার সর্বোচ্চ (৬০.১+) তার মধ্যে সুনামগঞ্জ একটি (মেহেদী, ২০০৫)। দারিদ্য ও আয়োডিনের অভাব ও পুষ্টিহীনতার দিক থেকে সুনামগঞ্জ জেলার নাম এসেছে সর্বাগ্রে। কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী নেই বলে হাওরাঞ্চলে বংশপরম্পরায় ধাত্রীবিদ্যায় হাতেখড়ি এমন ধাত্রীদের হাতেই মায়েদের সন্তান প্রসব করাতে হয়। নিপোর্ট-এর সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে, সিলেটে প্রতি এক হাজার জীবিত প্রসবের ক্ষেত্রে ১১০টি শিশু মারা যায়। হাওরাঞ্চলে শিশু মৃত্যুর উচ্চহারের প্রধান একটি কারণ এখানকার মায়েদের ঘণঘণ গর্ভধারণ। নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত ২০০৪ সালের অক্টোবরের জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে টোটাল ফার্টেলিটি রেট (টিএফআর) যখন মাত্র ৩-এ নেমে এসেছে তখন সিলেট বিভাগে এই হার ৪.২-এ এবং সুনামগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বেশী প্রায় ৪.৮৩ শতাংশ (মেহেদী, ২০০৫)।

২.৩.৯ *যোগাযোগ*

"বর্ষায় নাও আর শুকনায় পাও"-সংক্ষেপে এই ভাবে হাওর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করা যায়। অনন্য ভৌগলিক বাস্তবতার কারণে হাওর অঞ্চল বছরের দুটি সময় সম্পূর্ণ দুই ধরনের রূপ ধারণ করে। জৈষ্ঠ্যের শুরু থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত প্রায় পুরো অঞ্চল থাকে জলমগ্ন কিন্তু বর্ষার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। শুকনো মৌসুমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পা আর বর্ষার সময় হচ্ছে নৌকা।[১১] হাওর অঞ্চলে বর্ষা শুরু হয় আগে এবং এর স্থায়ীত্বকাল ও অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশী। এলাকাবাসীর মতে, হাওরের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করার সাথে সাথে যে ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে তা যথেষ্ট

> **সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা**
>
> *সুনামগঞ্জ জেলায় পাকা রাস্তার পরিমান ১৫০ কিলোমিটার । এছাড়াও সেমিপাকা রাস্তার পরিমান ৫২ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তার পরিমান ২২৭৯ কিলোমিটার। রেলপথ এবং নদীপথের পরিমান যথাক্রমে ২০ কিলোমিটার এবং ৯৮ নটিক্যাল মাইল।*
>
> ***(তথ্যসূত্রঃ বাংলাপিডিয়া - ২০০৯)***

---

[১০] প্রাগুক্ত; পৃষ্টা - ৪০।

[১১] বর্তমানে হাওর অঞ্জলগুলোতে শুকনো মৌসুমে মটরগাড়ীর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে এখন নৌকা ছাড়াও লঞ্চ এবং স্পীড বোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এগুলো সাধারণ মানুষের ব্যবহার ক্ষমতার বাইরে বলে তাদের শুকনো মৌসুমে সম্ভবল তাদের কর্মঠ পা।

উচ্চতায় নির্মাণ না করার ফলে হাওর অঞ্চলের প্রধান বাহন নৌকা, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি চলাচল করতে পারেনা। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে নেয়ামতপুর ব্রিজের ত্রুটিযুক্ত নির্মাণ কাজের ফলে এখনই ব্রিজের উপরিভাগ ভেঙ্গে নীচে পড়ে যাওয়ায় ঐ ব্রিজের নীচে দিয়ে নৌ-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার পশ্চাদপদতার কারণে হাওর অঞ্চলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা গ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছা সবকিছুই সমস্যা সঙ্কুল হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে যে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় প্রাকৃতিক কারণেই তা টেকসই হয়না। হাওর জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছে সুনামগঞ্জ। যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামোর মধ্যে পাকা রাস্তার পরিমাণ সবচেয়ে কম হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলায়। হাওরের মানুষেরা জলের সাথেই গড়েছিলেন এক স্বনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা যা অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে ক্রমেই বিলীন ও বিপন্ন হওয়ার পথে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে হাওরবাসীর চৈতন্যগত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে যা হাওর উন্নয়নের কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মাথায় রাখে না (সেন, ২০০৭)।

২.৪ হাওরের পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত গুরুত্ব

হাওর জেলা সমূহ অনন্য ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তবে সময়ের সাথে সাথে হাওর অঞ্চলের এই অনন্য বৈশিষ্ট্য হুমকির মুখে। হাওর এলাকার প্রাণ হচ্ছে ছোট-বড় অসংখ্য নদী, ছরা, আর খালসমূহ। পাহাড়ী ঢলের সঙ্গে এই ছোট-বড় অসংখ্য নদী, ছড়া খাল দিয়ে নেমে আসে কোটি কোটি টন পলি মাটি। আর এতে দিনে দিনে নদী এবং হাওরের তলদেশে ধীরে ধীরে পলি জমে হাওর অঞ্চলের পরিবেশ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। দিন দিন হাওর এলাকার প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়ে হাওর নামে মাত্র এখন হাওর আছে। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢলের পানিতে এক জলাবদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। হাওর এলাকার কৃষি প্রতিবেশ বদলে দিচ্ছে এই পাহাড়ি বালির স্তর। এখানে কোন ধরনের শস্য চাষ করতে হবে তা হাওরবাসীর জানা নেই (সেন, ২০০৭)। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে কথা বলে জানা যায়, জমিতে বালির কারণে কি পরিমাণ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ছে তার প্রকৃত তথ্য তাদের কাছে নেই। তবে বালির কারণে পরিবেশ ও প্রতিবেশের কিছু খন্ডচিত্র নীচের সারণি-৫ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৫: সুনামগঞ্জ জেলার পরিবেশ বিপর্যয়ের কিছু খন্ড চিত্র এবং এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ

ক্রম	বিপর্যয়ের ধরণ	ক্ষতিগ্রস্থএলাকার নাম	ক্ষতির পরিমাণ
০১	নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া	সমগ্র জেলা	১৪৫ মাইল নদীপথ এবং প্রায় ২০টি নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে
০২	বিলের তলদেশ পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়া	তাহিরপুর উপজেলা	শুধুমাত্র ২০ একরের নীচে ৪৭টি বিলের ২১টি
০৩	বিভিন্ন ছরা দিয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন পলি এসে ফসলী জমিতে পাহাড়ি বালির স্তর পড়ে চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়া	ছাতক, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভপুর, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, এই ছয়টি উপজেলার বিস্তীর্ণ ফসলী জমি	প্রায় ৯০ হাজার একর হাওর এলাকার

তথ্যসূত্র: বারসিক, ২০০৭।

সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মতে-যে পরিমাণ জমি আবাদী আছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং বাস্তবে কি পরিমাণ জমি আবাদী রয়েছে সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দাবী করেছেন সুরমা তার উৎস এলাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশেল উত্তরাঞ্চলের মতো হাওর এলাকা সমূহও একসময় মরুভূমিতে পরিণত হবে (সিদ্দিকী, ২০০৬)। হাওর অঞ্চলের এই পরিবেশগত পরিবর্তন এবং বিপর্যয়ের পিছনে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় কারণই দায়ী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

২.৫ জলাবদ্ধতা ও চরঃ হাওরবাসীর নতুন দুর্ভোগ

১৭৬৯-৭০ সালে দীর্ঘস্থায়ী খরায় বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ১৯৪৩ সালে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ খরার কারণে মারা যায় (নোভাক, ১৯৯৩)। হাওর জলাভূমির অঞ্চল হলেও এসব এলাকায় এখনো বিরাজ করে খরা। দিন দিন হাওর এলাকার প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য বদলে গিয়ে হাওর এখন নামে মাত্র হাওর আছে, বর্ষা মৌসুমে যা পাহাড়ি ঢলের পানিতে জলাবদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার দাড়াইন ও গোদী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হয়ে অনাবাদী পড়ে থাকে (দৈনিক সংবাদ, ২০০৬)। বর্ষায় একদিকে পাহাড় থেকে অজস্র জলরাশি নামে অপরদিকে সেই সঙ্গে বালি এসে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হাওর রক্ষা বাঁধের উচ্চতা কোথাও কোথাও ৬ মিটার থেকে ৪ মিটারে নেমে এসেছে। নেত্রকোনার প্রধান নদী সোমেশ্বরী, মহাদেও, লেঙ্গুরা, কংশ, উবদাখালী নদী শুকিয়ে চর পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বছরে আট মাস এসব নদীতে পানি না থাকায় এবং চর পড়ায় নদীগুলো বেদখল হয়ে যাচ্ছে।[১২] সরকারি পরিসংখ্যান এবং পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর মতে বর্তমানে সোমেশ্বরী নদীর প্রায় ২০ ভাগ বেদখল হয়ে গেছে।

[১২] মরে যাচ্ছে নদী, দৈনিক সংবাদ, মার্চ ১১' ২০০৬।

উজানের পাহাড়ি এলাকায় প্রতিবেশ পরিবর্তনের ফলে পাহাড় ধ্বসে বালি, নুড়ি ও পলির স্তর নীচে নেমে আসে। হাওরের বিস্তীর্ণ ভূমিতে এসব বালি, নুড়ি ও পলি জমা হয়ে দিন দিন চরভূমি তৈরী করেছে। এই বালির চরভূমির সাথে হাওরবাসীরা পরিচিত নন। এখানে কোন ফসল চাষ করা যায় তা হাওরবাসীর জানা নেই। আর এভাবেই হাওর এলাকায় খরা, জলাবদ্ধতা, চর তৈরী হয়ে জনজীবন ও প্রকৃতিতে নিয়ে এসেছে এক ভয়াবহ আশনি সংকেত।

২.৫ হাওর উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ: প্রাণ ও জীব-বৈচিত্র্যের উপর চরম আঘাত

প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিয়ে জর্জ পারকিন্স মারসের *'ম্যান এন্ড নেচার'* নামের গবেষণা থেকে আমরা বেশ কিছু বাস্তবিক অবস্থা দেখতে পাই। পৃথিবীর প্রাচীনতম বাঁধ সায়েদ-আল-কাফারা যা মিশরের রাজধানী কায়রোর ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে নীল নদের উপরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। ১১৭ মিটার লম্বা এবং নদীর পৃষ্ঠ হতে ১২ মিটার উচ্চ এই বাঁধের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সাময়িক সুবিধা হলেও তা প্রাকৃতিক জলধারার গতিপথ পরিবর্তণে প্রভাব ফেলেছে। এ যাবতকালে প্রাকৃতিক জলধারার উপর কোনো ধরণের অবকাঠামোগত স্থাপনা-তা বাঁধ হোক, ব্রিজ হোক, পানি বিদ্যূৎ প্রকল্প হোক-কোনো নুন্যতম স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৭৯৬ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের পর ভূ-স্বামীরা নদীর তীর বাঁধ দেওয়া শুরু করে এবং এসব বাঁধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বাঁধের আকার ছিল ছোট কিংবা নীচু মাটির আইল বা পানি প্রবাহের জন্য ফাঁকা জায়গায়।[১৩] ইদানিং কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যেকোনো ধরনের বাঁধ বা বাঁধের মত অবকাঠামোগত নির্মাণ মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। মার্কিন কৃষি ও সেঁচ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ইস্পান (Irrigation Support Project for Asia and Near East -ISPAN) সাম্প্রতিক তাদের একটি প্রকাশনায় বলেছেন, বাঁধ জমির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে এবং উর্বরতায় পরিবর্তন ঘটায় (আহমেদ, ১৯৯৪)। দেশে নদী, হাওর, পানি সম্পর্কিত যতগুলো প্রকল্প করা হয়েছে তা বরাবরই প্রাণ ও প্রকৃতির বিপক্ষে গেছে। দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক সম্পদ ব্যবহার করে তেরী করা 'ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান বা ফ্যাপ' দেশের জলপ্রতিবেশে যে চুড়ান্ত রকমের বিচ্ছিন্নতা তৈরী করেছে তা খুব সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জন্য পরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার 'ফ্যাপ' অনুযায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা প্রতিরোধের জন্য আংশিক বন্যা প্রতিরোধী ডুবন্ত বাঁধ, সম্পূর্ণ বন্যা প্রতিরোধের জন্য উঁচু বাঁধ, নদী সংযোগ, নদী ও খাল খনন, পানি ধারনের জন্য অবকাঠামোগত নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফ্যাপ-৬ (১৯৯৩) অনুযায়ী দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ১৯টি সাময়িক বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৬টি প্রকল্পই মৎস্য ক্ষেত্রের জন্য নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। এর মধ্যে আবার বাকী ৯টি প্রকল্পের কোন না কোন প্রভাব মৎস্য ক্ষেত্রে পড়েছে। পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮টি প্রকল্পের ভেতর ৮টি প্রকল্পেরই নেতিবাচক প্রভাব মৎস্য ক্ষেত্রে বিরাজমান (আলী, ১৯৯৭)। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে ও বন্যার সময় মিঠা পানির মাছদের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ও মৃত্যু ঝুকি বেড়ে যায়। ১৯৯২ সালে মধ্য জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সুনামগঞ্জের শনির হাওর বন্যায় পুরো ভেসে যায় এবং এই পূর্ণ বন্যার সময়টাই মাছেদের উৎপাদনের মূল সময়।

জনগণ বিচ্ছিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন কর্মী আর ঠিকাদারের আর্থিক লাভ হতে পারে। কিন্তু একবার ভাবা দরকার এর ফলে হাওর জলাভূমির প্রাণ ও প্রকৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। জলাভূমি এলাকায় নানান উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে স্থানীয় প্রতিবেশ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রাণ বৈচিত্র্যের বহুপাক্ষিক সমাহার। এতে ভেঙ্গে পড়ে স্থানীয় প্রতিবেশের সাথে মানুষের আন্ত:সম্পর্ক এবং স্থায়িত্বশীল বাস্তুতন্ত্র। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ দাতা সংস্থার উন্নয়ন নীতিতে চলা রাষ্ট্রের বল প্রয়োগকারী পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্পসমূহের জন্য আজ হাওর জলাভূমির অনেক মাছ বৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাণ্যাল এবং চক্রবর্তী ১৯৯৫ সালে দেখিয়েছেন, কিভাবে ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার ২৫ বছর অধিক সময় পারেও তার প্রভাব ভাগিরথী ও হুগলী নদীর মোহনায় প্রশ্ন সাপেক্ষ রয়ে গেছে। এক লাখ আধিবাসীকে উচ্ছেদ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির কর্ণফুলী নদীর উপর জোর করে বসানো কর্পোরেট মুনাফাকারী 'কাপ্তাই জলবিদ্যূৎ উন্নয়ন প্রকল্প' আজ প্রায় বন্ধের পথে, কাপ্তাই কৃত্রিম জলধারের পানি শুকিয়ে চর তৈরি হচ্ছে।

জেনিফার দ্যইনি সম্পদ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় প্রকল্পগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় উদ্যেগ ও গ্রামের স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহকে অর্ন্তভূক্ত না করার ফলে প্রকল্পসমূহ সর্বজনগৃহীত ও স্থায়ীত্বশীল হয় না (দ্যইনি, ১৯৯৯)। এ কারণে ১৯৯৬ সালে সুনামগঞ্জের চেপটির হাওরের ফসল রক্ষার জন্য স্থানীয় গ্রামের মানুষেরা দিনে রাতে মাটি কেটে ৬০ হাজার টাকার ভেতর বাঁধ নির্মাণ করেন। এতে করে প্রায় ২৬ গ্রামের কৃষকের ফসল রক্ষা করেন। হাওর সম্পর্কিত উন্নয়ন নীতিমালা ও আন্ত:রাষ্ট্রীক আলোচনায় অবশ্যই স্থানীয় মানুষ এবং মানুষের নিজস্ব হাওর ব্যবস্থাপনা

---

[১৩] পশ্চিমবঙ্গ: ক্ষীণকায় প্রকৌশল এবং সংঘাত, জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় ও বিদিশা মালিক, পৃ ৬৩-৯৯। এটি নেওয়া হয়েছে গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত: দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনা নামক বই থেকে। (মূল গ্রন্থ: Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ: হেমন্ত ফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল, ২০০৪।

জ্ঞান অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করা জরুরী বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। উন্নয়ন আঘাতের বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে বারবার মানুষ যৌথ ও সমস্বরে দাঁড়িয়েছে। যখন হাওর এলাকার ভূমির *টংক প্রথা*, *নানকার প্রথা*র মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে দখল করা হচ্ছিল তখনো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল হাওরবাসী এবং সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করেছিল। জনগণের হাওরভূমি যখন বারবার ক্ষমতার জোড়ে ইজারার মাধ্যমে দখল পাল্টাদখল চলতে থাকে তখনো হাওরবাসী জনগণ *'ভাসান পানি আন্দোলন'* সংগঠিত করেছিলেন। ন্যায় বিচারের দাবিতে জলাভূমির প্রান্তিক জনগণ বারবার নানান সময়ে রাজনৈতিক তর্কে বলপ্রয়োগকে প্রশ্নাতিতভাবে প্রতিহত করেছিলেন।[১৪]

২.৬ হাওর এবং হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড

হাওর উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। হাওর জেলা সুনামগঞ্জের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যুক্ত রয়েছে। বন বিভাগ ও পরিবেশ বিভাগ, ভূমি জরিপ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বন্যা ও পুণ:র্বাসন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-এসব এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এছাড়া সার্বক্ষণিকভাবে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখার জন্য ২০০০ সালে গঠন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'। ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখের এক সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠিত হয় এবং ১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বোর্ডটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালের অন্য একটি রিজিলিউশনের মাধ্যমে সকল হাওর ও জলাভূমি সমন্বিতভাবে উন্নয়ন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পূনরায় *'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'* কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্ন্তভূক্ত করেন।[১৫]

<u>সুনামগঞ্জে সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান</u>

সরকারি সংস্থা: *সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এরকম সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে - বন ও পরিবেশ বিভাগ, ভূমি জরিপ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বন্যা ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য।*

বেসরকারি সংস্থা: *ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা, শোভা, মসজিদ মিশন, বার্ড, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বাওপা, সিএনআরএস, ভিশন-২০০০, কেয়ার বাংলাদেশ, হীড বাংলাদেশ, আইইউসিএন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।*

২.৭ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

হাওর জেলা সমূহের উন্নয়নে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করলেও বাস্তবে তা বিভিন্ন কারণে কার্যকর হয়নি। বোর্ডের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। নির্বাহী কমিটির প্রধান হচ্ছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী। ১২ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ, বন ও পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রিরা।[১৬] বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়নে বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ হচ্ছে হাওর ও জলাভূমির উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ সমূহ নিবরূপ।[১৭]

১. বাংলাদেশ হাওর এবং জলাভূমির উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। হাওর এবং জলাভূমির সামগ্রিক (Integrated) উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা;
২. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তুত (Formulate) করা এবং প্রকল্প সমূহ স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

---

[১৪] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত ঘেঁষে কুশিয়ারা নদীতে তৈরি করা হয়েছির সরকারি প্রকল্পের বাঁধ এর ফলে জকিগঞ্জ থানার বিরশ্রী ইউনিয়নের কৃষকেরা সেঁচের জন্য পানি পেলেও বরহল ইউনিয়নের মানুষের জমি প্রতি বছর বন্যায় তলিয়ে যেত। বরাক নদী থেকে নেমে আসা বালি ও পলিতে কৃষি জমিগুলো ভরে যায়। বাধ্য হয়ে বরহল ইউনিয়নের নারী পুরুষ সর্বনাশা এই বাঁধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। ২৬ জুলাই ১৯৯৩ সালে বরহল ইউনিয়নের হাজার হাজার নারী-পুরুষ প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সীমান্ত বর্তী বাঁধ এলাকায়। গ্রামের ২০০০ নারী পুরুষ বাঁধ কেটে দেওয়ার প্রস্তুতি নিলে কোনো ধরনের জানান না দিয়ে সতর্ক করে না দিয়ে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ রাইফেলসের বন্দুকের গুলিতে ৪জন গ্রাম বাসী নিহত হন এবং প্রায় ৫ জন গ্রামবাসী আহত হন। (Existing embankments, Monowar Hossain, p53-76. in: Rivers of Life: Bangladeshi Journalists take a critical look at the flood action plan, Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994)

[১৫] সুত্র: বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৬/০৯/২০০০ইং, নং পাসম-উঃ৫/বিবিধ-১৯/২০০০/৩৮৩।

[১৬] News From Bangladesh-An article written by Shakhawat Liton, Wednsday, January 26, 2005 http://www.bangladesh-web.com/preview.php

[১৭] http://www.mowr.gov.bd/haor.htm

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সমন্বয়সাধন করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা;
৪. বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

হাওর এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার হলেও এই প্রাথমিক ব্যবহারকারীরাও দিন দিন হারিয়ে ফেলছে হাওরের অধিকার। হাওর এলাকায় দিন দিন দারিদ্র্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কর্পোরেট বাজার চাহিদা। এককালের স্বনির্ভর হাওরবাসীরা দিন দিন আপন পেশা পরিবর্তন করে পাথর কোয়ারী, ইট ভাটা, গার্মেন্টস, নির্মাণ শ্রমিক ও শহরের বাসাবাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। যাও কিছু মানুষ গ্রামে থাকতে পারেন তারাও ধনীদের দখল ও লীজকৃত বিলের 'ফিশারীজ খামারের' শ্রমিক বা পাহারাদার বা অন্যের জমিতে নানান চুক্তিতে বর্গা চাষ করেন। হাওরের স্ব-প্রতিবেশ বিপন্ন হওয়ার পাশাপাশি হারিয়ে গেছে হাওর এলাকার অগণিত জীবন সম্পদ এবং এই সম্পর্কিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা। অকাল বন্যা ও পাহাড়ি ঢল, খরা, বৃষ্টিহীনতা, শিলাবৃষ্টিসহ নানান দুর্যোগ চলতি সময়ে আরো বেড়েছে। বছরের এক দীর্ঘ সময় আশ্বিন থেকে চৈত্র্য মাস পর্যন্ত হাওরবাসীর ঘরে খাবার থাকে না, হাওর জনপদ জুড়ে তখন চলে দু:সহ 'চিনা/নিদানে'র কাল। হাওর এলাকায় *'ভাসান পানি আন্দোলন'*, *'কাউয়াদীঘি'*সহ হাওর এলাকায় *'খাস জমির আন্দোলন'*, *'নানকার বিদ্রোহ'*, *'তেভাগা আন্দোলন'*, *'টংক বিদ্রোহ'*, কৃষক আন্দোলনসহ হাওর এলাকায় গণ-প্রতিরোধ এবং জন-আন্দোলনগুলোকে বারবার পাশ কাটিয়ে এমন সব হাওর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যা হাওর ও হাওরবাসীর জন্য কোন প্রকার কল্যাণ বয়ে আনেনি। হাওর উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচীতে স্থানীয় বৈচিত্র্য, স্থানীয় জনগণের মতামতকে অংশীদার না করার ফলেই হাওর আজ হয়ে উঠেছে হাহাকার আর আহাজারির এক জনবিচ্ছিন্ন জনপদ। হাওর জনপদের কৃষি প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় হাওরবাসী, উন্নয়নকর্মী, জনপ্রতিনিধি, এনজিও কর্মী, শিক্ষা প্রতিনিধি, সংস্কৃতিকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, গবেষক, বিজ্ঞানীসহ সকলেই হাওরের জন্য এক সমন্বিত হাওর নীতিমালার কথা বলে আসছেন। জনগণের এই জরুরী অভিমতকে সকলে মিলে কার্যকরী এবং বাস্তবিক করে তোলার জন্যই সমন্বিত হাওর নীতিমালার উদ্যোগ কার্যকরী করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও হাওর উন্নয়ন প্রকল্প

হাওর অঞ্চলে কৃষকরা বছরে একটি মাত্র ফসল (বোরো ধান) ঘরে তুলতে পারে, বাকি ৬/৭ মাস ফসলের জমি পানিতে ডুবে থাকে। বোরো ধান সাধারণত বৈশাখ মাস বা মধ্য এপ্রিল থেকে জৈষ্ঠ বা মে মাস পর্যন্ত কাটা হয়। ফসল কাটার এ সময়টি হাওর এলাকায় সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সময় সুনামগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা পাহাড়ি ঢলের আকারে নীচে নেমে আসার ফলে হাওরের ফসল ডুবে যায়। এ ধরনের পাহাড়ি ঢল এতো দ্রুততার সাথে নেমে আসে যে, হাওর অঞ্চলের কৃষকরা তাদের ফসল কাটার সময় পায় না। তাই হাওরের সঙ্গে সংযুক্ত নদীর পানি এবং পাহাড়ি ঢলের পানি যদি ফসল কাটার সময় পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা যায় তাহলে সমগ্র হাওরের ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয়। এই কারণে বোরো ফসল রক্ষার জন্য হাওরকে ঘিরে বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ'কে হাওরের ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব দেয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালের দিকে *'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'* গঠণ করে বোর্ডের নিজস্ব বাজেট থেকে হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণে অর্থ দেওয়া হলেও বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সরকারি একক কর্তৃত্ব এখনো পাউবো-সুনামগঞ্জের। এ কারণে পাউবো-সুনামগঞ্জের প্রধান কাজ হচ্ছে হাওর অঞ্চলে ডুবো বাঁধ নির্মাণ করা। এছাড়াও শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, স্লুইচ গেইট নির্মাণ, নদী খননসহ পানি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ। এই অধ্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঠন, কার্যক্রম, পাউবো-সুনামগঞ্জের গঠন, জনবল, বিগত বছরে গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও পাউবো-সুনামগঞ্জের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যাবলী, আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পাউবো-সুনামগঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে হাওর এলাকায় ডুবো বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশের পানি সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৫৯ সাল থেকে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে *'পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে'*র অধীনে পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বিভিন্ন সময়ে সরকারের রাজনৈতিক এবং দলীয় স্বার্থের হস্ত ক্ষেপের কারণে প্রতিষ্ঠানটি থমকে দাঁড়িয়েছে। তথাপিও মানুষের দোড় গোড়ায় সরকারের পানি সম্পর্কিত সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট নীতিগুলোর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে *'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের'* বিভিন্ন জেলা বা শাখা অফিসের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন জোন এবং সার্কেলের অধীনে বিভিন্ন জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থাপিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি অফিসগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঠণ এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৩.১.১. <u>পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঠন</u>

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ১৯৫৯ সালে *'ইস্ট পাকিস্তান পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'* (East Pakistan Water and Power Development Authority) হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এই সংস্থাকে পুণর্গঠনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়।[১৮] বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশকে ৬টি জোন এবং ১৮টি সার্কেলে ভাগ করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামঞ্জের অবস্থান হচ্ছে উত্তর-পূর্ব জোনে এবং সিলেট অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের অধীনে (Sylhet Operation & Montoring Circule)।

৩.১.২. <u>বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলী</u>

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[১৯] বোর্ডের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের মতো কাজেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বন্যা, খরা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা, বিভিন্ন ধরনের মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করাও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আওতাভূক্ত। নিবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

---

[১৮] পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৯] প্রাগুক্ত ।

৩.১.২.১. *কাঠামোগত কার্যক্রম*

১. নদীর উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেঁচের উন্নয়ন এবং খরা প্রতিরোধের জন্য জলাধার, ব্যারেজ, রিজার্ভার, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ;
২. পানির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদীর উৎসমুখ থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং মৎস্য চাষ, নৌ-চলাচল, বনাঞ্চল রক্ষা, বন্য প্রাণী রক্ষা এবং পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করা;
৩. নদী শাসন এবং নদীর তীর (বেঙ্ক) রক্ষা করার মাধ্যমে শহর, হাট-বাজার এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান সমূহ রক্ষা করা। জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহকে ভূমি ক্ষয়ের মতো দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা;
৪. উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা;
৫. লবণাক্ততা এবং বনাঞ্চল উজার হওয়া প্রতিরোধ করা; এবং
৬. বৃষ্টির পানিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে সেঁচ কার্যে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরী, পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং খাবার পানির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.১.২.২. *অ-কাঠামোগত কার্যাবলী*

১. বন্যা এবং খরা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা এবং সতর্ক করা;
২. হাইড্রোলজিক্যাল (Hydrological) জরিপ এবং অনুসন্ধান করা;
৩. বনাঞ্চল এবং মাছের খামারসমূহ রক্ষা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করা;
৪. মৌলিক (Basic) এবং ফলিত (Applied) গবেষণা পরিচালনা করা; এবং
৫. পানি ব্যবহারকারীদের সংগঠন গড়ে তোলা, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের স্থায়ীত্বের জন্য পানি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.২ অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত অপারেশন এবং মনিটরিং বিভাগ সমূহ মূলত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধায়ণ করে থাকে। নিম্নে অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত সমাপ্ত প্রজেক্টের ইনভেন্টরি প্রস্তুত করা এবং তা হালনাগাদ করা;
২. এন.ডব্লিউ.পি.ও অনুসারে ৫,০০০ হেক্টর এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা;
৩. ৫,০০০ হেক্টরের কর্ম এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দিক নির্দেশণা এবং সহায়তা প্রদান;
৪. সরকারী অর্থায়ন এবং নির্দেশণা অনুসারে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের পুণর্বাসন করা;
৫. ১,০০০ হেক্টর বা এর নীচে পুণর্বাসিত অথবা চলমান প্রকল্প স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর;
৬. এন.ডব্লিউ.পিও অনুসারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
৭. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৮. অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যয় পুনঃরুদ্ধার, নির্ধারিত এলাকার উন্নয়ন; এবং
৯. প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা, ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ করা, জরুরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে জরুরী মেরামত করা, ইত্যাদি।

পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় হাওর রক্ষা বাঁধ, স্লুইচ গেইট নির্মাণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা। পাশাপাশি পাউবো-সুনামগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সম্পদ উন্নয়নের যাবতীয় কাজগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকী করে থাকে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য যেকোন কার্যক্রমও বাস্তবায়ন ও তদারকী করার জন্য পাউবো-সুনামগঞ্জের মানিটরিং ও তদারকী অফিসকে প্রস্তুত থাকে।

৩.৩ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ

পাউবো-সুনামগঞ্জের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব জোনের প্রায় ১৯,১৪৯.৮১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জূড়ে অবস্থিত (সারণি-৬)। এর মধ্যে সিলেট অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের কার্যক্রম হলো সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ৭,১২১.৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সারণি-৬: পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জের অবস্থান এবং কার্যক্রম এলাকা

অবস্থান	জোন	এলাকা*	জেলা
জোন	উত্তর-পূর্ব	১৯,১৪৯.৮১ বর্গ কি:মি:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট
সার্কেল	সিলেট অপারেশন এন্ড মনিটরিং	৭,১২১.৬০ বর্গ কি:মি:	সুনামগঞ্জ, সিলেট
*অপারেশন এবং মনিটরিং সার্কেলের আওতাভূক্ত জেলাসমূহ এবং কর্ম এলাকার পরিমাণ			

তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

ফসলের গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎকালীন সরকার হাওরের চারপাশ দিয়ে ডুবো বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন, যা স্থানীয়ভাবে *‘আফর বাঁধ’* বা ‘আফরমারা বাঁধ’ নামে পরিচিত। এই বাঁধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বছরের একটা সময় এই বাঁধ পানির নীচে থাকে এবং অন্য সময় পানি নেমে গেলে তা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা যায়। এই বাঁধ এমন উচ্চতায় নির্মাণ করা হয় যাতে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগাম বন্যা হয় তা থেকে হাওরের ফসলকে রক্ষা করতে পারে এবং বর্ষাকালে তার উপর দিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে হাওরে পানি প্রবেশ করতে পারে যা মৎস্য চাষের জন্য প্রধান অবলম্বন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ‘কাবিখা-কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ এবং ‘কাবিটা-কাজের বিনিময়ে টাকা’ এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের দ্বারা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হতো।[২০] পরবর্তীকালে টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার দিয়ে কাজ করানো শুরু হয়। হাওর অঞ্চলের বাস্তবতায় টেন্ডার পদ্ধতির বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিলে ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ সালে সরকার ঠিকাদার পদ্ধতি বাতিল করে *‘পিআইসি’*র (Project Implementation Committee) মাধ্যমে কাজ করানো হয়। কিন্তু ২০০৭ সালে সরকার পুনরায় ‘পিআইসি’ পদ্ধতি বাদ দিয়ে টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার দিয়ে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ৩৪টি হাওরে সর্বমোট ১,৩৬৭ কিমি বাঁধ নির্মাণ ও ছোট বড় প্রায় ৫৮টি অবকাঠামোগত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।[২১]

৩.৪ পাউবো-সুনামগঞ্জের বর্তমান জনবল

পাউবো, সুনামগঞ্জের বর্তমান জনবল থেকে দেখা যাচ্ছে, মোট অনুমোদিত পদ ৯৭টির মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৩৯ জন এবং শূণ্যপদ রয়েছে ৫৮টি। এই হিসেবে পাউবো, সুনামগঞ্জে বর্তমানে ৫৯.৮% জনবলের শূণ্যতা রয়েছে (সারণি-৭)।

সারণি-৭: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের জনবল

ক্রম	অনুমোদিত পদ		বর্তমান অবস্থা	
	পদের নাম	সংখ্যা	বিদ্যমান	শূণ্য পদ
০১	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১	০
০২	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৪	৩	১
০৩	সহকারী প্রকৌশলী	১	০	১
০৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	৯	১
০৫	প্রাক্কলনিক	১	০	১
০৬	উচ্চমান সহকারী	১	০	১
০৭	উর্ধ্বতন হিসাব সহকারী	১	০	১
০৮	হিসাব করণীক	৫	১	৪
০৯	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	০	১
১০	নিবমাণ সহকারী/ডিইও	৭	২	৫
১১	রাজস্ব সার্ভেয়ার	১	০	১
১২	ডিএমও	১	০	১
১৩	ড্রাইভার	৩	১	২
১৪	অন্যান্য (ট্রেসার, এমএলএসএস, সার্ভেয়ার, কুক ইত্যাদি)	৬০	২২	৩৮
১৫	**মোট**	**৯৭**	**৩৯**	**৫৮**

তথ্যসূত্র: নথিপত্র, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ-২০০৮।

উপরোক্ত সারণি-৭ এ দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্ন-পদস্থ বা কর্মচারীদের পদগুলোর শূণ্যতার হারই সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে দেখা যায়, হিসাব করণীকের ৫টি পদের বিপরীতে মাত্র একজন কর্মরত রয়েছেন, অর্থাৎ ৪টি পদই শূণ্য। এছাড়াও সহকারী হিসাব রক্ষকের ১টি পদের মধ্যে ১টি, নিম্ন সহকারীর ৭টির মধ্যে ৫টি এবং অন্যান্য ৬০টি পদের মধ্যে ৩৮টি পদই শূণ্য রয়েছে বলে গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়েছে।

[২০] প্রতিবেদন-২০০৪; এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং সিএনআরএস কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত।

[২১] পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।

৩.৫ পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক অবকাঠামোগত নির্মাণ

পাউবো-সুনামগঞ্জের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে হাওরের ফসল রক্ষার্থে ডুবো বাঁধ নির্মাণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ। সে লক্ষ্যে পাউবো-সুনামগঞ্জ কয়েকটি সাব অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে (যেমন: দিরাই সাব অফিস)। **১৯৬৬** সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি অফিস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তার মধ্যে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সুনামগঞ্জ জেলার মোট ৩৪ টি হাওরে **১৩৬৭** কিলোমিটার ডুবো বাঁধ নির্মাণ, ৪.৫ কিলোমিটার ক্লোসার ডেম, ১১৬.৯৬ কিলোমিটার খাল খনন এবং পূর্ণ খনন, ৮৪ টি স্লুইস গেইট নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে (সারণি-১০)।

সারণি-৮: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক অবকাঠামোগত নির্মাণ চিত্র (২০০৮ সাল পর্যন্ত)

জেলা	অবকাঠামোর নাম এবং পরিমাণ (কিলোমিটার)					হাওরের সংখ্যা
	ডুবো বাঁধ (কি:মি:)	ক্লোসার ডেম (কি:মি:)	কেনেল (কি:মি:)	স্লুইচ গেইট	তীর সংরক্ষণ	
সুনামগঞ্জ	১৩৬৭	৪.৫০	১১৬.৯৬	স্লুইচ- ৫৮ পাইপ স্লুইচ-২৬	.৮৬০	৩৪

তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত।

৩.৬ আর্থিক বরাদ্দ বা বাজেট ও ব্যয়

পাউবো-সুনামগঞ্জ প্রতি বছর বিভিন্ন কাজের পরিমাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে ঢাকা কেন্দ্রিয় অফিসে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী টেন্ডার প্রদান এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নিবে পাউবো-সুনামগঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো-

সারণি-৯: ২০০৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ক্রম	অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
০১	২০০৯-২০১০	১,৪৮৭.২৩	১,৪৩৯.৩০	টেন্ডার পদ্ধতি
০২	২০০৮-২০০৯	১,২৪০.৫০	১,২৩৫.৩৪	
০৩	২০০৭-২০০৮	১,৩৮০.৩০	১,৩৮০.১৮	
০৪	২০০৬-২০০৭	৮২০.২৯	৮১২.৬৩	পিআইসি পদ্ধতি
০৫	২০০৫-২০০৬	৮৯৫.৩৮	৮৭৫.০৪	
০৬	২০০৪-২০০৫	১,২৮৯.৩২	১,১৯৬.৩২	টেন্ডার পদ্ধতি
০৭	২০০৩-২০০৪	৯২৮.৬৩	৯১৬.৭০	
মোট		৫,৩১৩.৯২	৫,১৮০.৮৭	

তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

উপরের সারণি-৮ হতে দেখা যায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট পাঁচটি অর্থ বছরে পাউবো, সুনামগঞ্জ মোট ৫৩ কোটি **১৩** লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ পায়। এর মধ্যে **৫১** কোটি ৮০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে।

৩.৭ হাওরের ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের ধরন, কার্যকারীতা এবং প্রভাব

পাউবো-সুনামগঞ্জ থেকে ডুবো বাঁধের মাধ্যমে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ফসল রক্ষা পাচ্ছে বলে দাবী করা হলেও এ ব্যাপারে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, সত্যিকার অর্থে হাওরের ফসল রক্ষার্থে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক নির্মিত বাঁধের ভূমিকা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যে বছর অকাল বন্যার প্রকোপ কম ছিলো কেবল সে বছর ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জের অনিয়ম ও দুর্নীতিই অনেক ক্ষেত্রে নিয়মে পরিণত হয়েছে। পাউবো-সুনামগঞ্জ এখন পর্যন্ত ৩৪টি হাওরে তাদের কার্যক্রম পরিচালন করছে। পাউবো, সুনামগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুসারে এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজে সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ২,১৫,০০০ (হেঃ) এবং সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে ২৪,০০,০০০ লক্ষ যেখানে বাংলাপিডিয়ায় প্রদত্ত্ব তথ্য অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যার ২০,১৩,৭৭৮ (বিবিএস, ২০০১)।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় পাউবো-সুনামগঞ্জ হাওরের ফসল রক্ষায় দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। হাওরে বাঁধ নির্মাণের চেয়ে পুনঃনির্মাণের কাজের পরিমাণই বেশী।[২২] পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত্ব তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর বর্ষায় বন্যার পানি হাওরে প্রবেশ করার সময় একবার এবং হাওর হতে বের হয়ে যাবার সময় একবার নির্মিত বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাছাড়া

[২২] পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ব বিশ্লেষণ।

জনগণের নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য এবং মৎস্য চাষের জন্যও স্থানীয় লোকজন বাঁধ কেটে দেয়। ফলে প্রতিবছরই বাঁধ পুনঃনির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেকেই মনে করেন পাউবো-সুনামগঞ্জের হাওরের ফসল রক্ষার্থে যে ডুবো বাঁধ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ এবং সংস্কার কার্যক্রমে টাকা ব্যয় করে তার পুরোটা যদি সুষ্ঠ মতো ব্যয় হতো এবং বাঁধ নির্মাণ কাজে যদি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকতো তাহলে সুনামগঞ্জ হাওর এলাকার মানুষের দরিদ্র্যতার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের তীব্রতা কিছুটা হলেও হ্রাস হতো। কারণ সুনামগঞ্জ হাওর এলাকাকে শষ্যের ভান্ডার হিসেবে অভিহিত করা হয়। তথাপিও দেখা যাচ্ছে, সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের দূর্বল নীতি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে সে শষ্য ভান্ডারের জনগণকেই দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার অভাবকেও কম দায়ী করা যায় না।

প্রশাসনের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা গেলে এবং অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করা গেলে সমাজের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব। তবে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা এবং কাজের মানের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতাও বৃদ্ধি জরুরী। পাউবো-সুনামগঞ্জের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করার জন্য যে পরিমাণ লোকবল প্রয়োজন সে পরিমাণ লোকবলের অভাবের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারছে না। জনবলের শূণ্যতার কারণে কাজের গতিশীলতা আসছেনা বলে মনে করেন কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় বাজেটও সীমাবদ্ধ এবং বাজেট প্রাপ্তিতেও অনেক দেরী হওয়ায় সময়মতো বাঁধের কাজ শুরু করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে সমস্যা: অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরণ

বাংলাদেশের উত্তরে মেঘালয় পাহাড়, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড় ভূমি, পূর্বে মণিপুরের পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা বর্ষার পানি হাওর এলাকায় *'নলতল বাইরা'*[২৩] বা 'সর্বব্যাপি প্লাবন' তৈরী করে। কখনো কখনো বন্যা জলের উচ্চতা ৬ ফুট ছাড়িয়ে যায়। এসময় *'আফাল'* বা *'আফরমারা'*র[২৪] তান্ডবে এলাকাবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সুনামগঞ্জের হাওরবাসী মাত্র ২০০৩ সালেই একবার বোরো ফসল ঘরে তুলতে পেরেছিল।[২৫] আকস্মিক ও অকাল বন্যার ফলে ফসলহানীর কারণ খুজতে গিয়ে দেখা গেছে বাঁধগুলোর নির্মাণ ছিলো ত্রুটিপূর্ণ যা ফসল রক্ষায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এমনকি নূন্যতম সময়ের জন্য অকাল বন্যার পানির চাপ মোকাবেলা করতে পারেনি। পানি প্রবাহের প্রথম আঘাতেই এগুলো ভেঙ্গে যায় এবং ফলাফল হিসেবে হাওরের ফসল পানির নীচে তলিয়ে যায়। এই অধ্যায়ে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে পাউবো-সুনামগঞ্জের কার্যক্রম, বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতি, বাস্তবায়নে জড়িত ঠিকাদার ও পিআইসি কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.১ হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ ভাঙ্গার কারণ

সুনামগঞ্জ জেলার হাওরে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার ফসল উৎপন্ন হওয়া এবং জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সরকারের উদ্যোগ অতি নগণ্য। এছাড়াও বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় এবং আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মের কারণে বাঁধ নির্মাণ করার পরেও দেখা যাচ্ছে ফসল রক্ষা করা যাচ্ছে না। হাওর অঞ্চলের বাঁধগুলো এমনভাবে নির্মিত হয় যেন, তা শুধুমাত্র হাওরের ফসল রক্ষা করবে কিন্তু অন্য কোন প্রাণী বৈচিত্র্যকে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবেনা। ফসল উঠে যাওয়ার পর হাওরের মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য স্থানীয় লোকজন বাঁধগুলো কেটে দেয়। তাছাড়া পরিবেশগত এবং প্রতিবেশগত কারণেও হাওর এলাকায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়না। কিন্তু প্রায়শই এসব ডুবো বাঁধও কার্যত ফলপ্রসু হয়না বরং কখনো কখনো তা হাওরের জনজীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনে। পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা, মূখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারে বাঁধ ভাঙ্গার যে কারণগুলো জানা যায় সেগুলো হলো:

১. ***বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতি:*** বাঁধের কাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে/ধাপে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অত্যন্ত নিন্মমানের বাঁধ তৈরী হয় বিধায় 'অকাল বন্যা'র স্বাভাবিক মাত্রায়ও এ বাঁধ টিকতে পারে না। বাঁধ নির্মাণের এসব অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে এক শ্রেণীর অসাধু ঠিকাদার এবং পাউবো, সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত।

২. ***ত্রুটিপূর্ণ নকশা:*** বাঁধের নকশা সময়োপযোগী না হওয়ায় এবং তা পানির চাপ মোকাবেলায় সক্ষম না হওয়ায় পানির অল্প চাপেই ভেঙ্গে যায়। এছাড়াও বাঁধগুলোর নির্মাণ খরচ কমানোর জন্য এটেল মাটির পরিবর্তে বেলে মাটি ব্যবহার করা হয় এবং বাঁধগুলোর ঢাল অত্যন্ত কম হওয়ায় এবং ঢালগুলোতে ঘাঁসের কার্পেটিং না দেওয়ায় বাঁধগুলো পানির চাপ মোকাবেলা করতে পারে না।

৩. ***বাঁধ নির্মাণ ও সমাপ্তিতে বিলম্ব:*** নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ডুবো বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু ও শেষ হয়। ফলে বাঁধের মাটি নরম ও কাঁচা থাকার কারণে পানির অল্প চাপও মোকাবেলা করার মতো মজবুত হয়ে উঠতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঁধ নির্মাণ কাজ বন্যার আঘাত হানার সময়ও অসমাপ্ত থাকে। এছাড়াও অনেকে মনে করেন পদ্ধতিগত জটিলতার কারণেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় বেশি প্রয়োজন হয়।

৪. ***প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা:*** বাঁধ নির্মাণ, পুন: নির্মাণ এবং সংস্কার কাজে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী যেমন: বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি ব্যবহার না করায় বাঁধের স্থায়িত্ব কমে যায়। এছাড়াও দরপত্রে বাঁধে মাটি ফেলার পর

---

[২৩] পাহাড়ি ঢল বা অকাল বন্যার তোড়ে খুব দ্রুত যদি হাওর এবং হাওর সংলগ্ন এলাকা তলিয়ে যায় এবং মনে হতে পারে যে এই বন্যা সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে-তাকে স্থানীয় ভাষায় 'নলতল বাইরা' বলা হয়। এই ধরনের বন্যার প্রকোপ সব বছর হয় না - বাংলাদেশে সাধারণত ৪ বছর পরপর এ ধরণের বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। এর ফলে হাওরের ফসল বন্যার পানির নীচে তলিয়ে যায় সাথে সাথে স্রোতের তীব্রতার কারণে অনেক সময় মানুষের লোকালয়গুলোও বিলীন হয়ে যায়।

[২৪] হাওরের প্রচন্ড ঢেউয়ের কারণে বসবসতি ভাঙ্গনের কবলে পড়ে - যাকে স্থানীয় ভাষায় 'আফরমারা' বলা হয়ে থাকে। এর ফলে দেখা যায়, হাওরবাসী লোকদের অনেকে বাস্তুহারা হচ্ছে।

[২৫] সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।

দুরমুজ করার কথা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে খুব কম বাঁধেই তা করা হয়। যে কারণে নির্মিত নতুন বাঁধের মাটি আলগা থাকে এবং পানির অল্প চাপেই তা ভেঙ্গে যায়।

৫. ***স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা:*** টেন্ডার পদ্ধতিতে কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই, নকশা প্রণয়ন, বাঁধ নির্মাণ ও বাস্তবায়ন কোন ধাপেই স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারের প্রকার অংশগ্রহণ থাকেনা। স্থানীয় জনগণকে বাঁধ নির্মাণের কাজে সম্পৃক্ত না করার কারণে এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাস্তবসম্মত না হওয়ায় বাঁধের স্থায়িত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়।

৬. ***অস্থানীয় ঠিকাদারদের অংশগ্রহণ:*** টেন্ডার পদ্ধতির কারণে অস্থানীয় ঠিকাদারদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং অস্থানীয় ঠিকাদাররা এলাকার বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচিত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ বাঁধ নির্মাণ করার সম্ভাবনা তৈরী হয়। তাই এ ব্যাপারে তাদের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৭. ***স্থানীয় ভৌগলিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দেওয়া:*** হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা অন্যান্য এলাকার তুলনায় ভিন্ন। কিন্তু পাউবো-সুনামগঞ্জ হাওরে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেয়না। তাই স্থানীয় ভৌগোলিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দিয়ে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের ফলে কার্যত এ বাঁধগুলো কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনা।

কেস স্টাডি-৩

সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় 'ডেকার হাওরের' ফসল রক্ষা

স্থানীয় জনগণ ও সেনাবাহিনীর তরিৎ উদ্যোগে রক্ষা পেয়েছে 'ডেকার হাওরে'র কোটি কোটি টাকার ফসল। হাওর জেলা হিসেবে পরিচিত সুনামগঞ্জের প্রায় পুরোটাই হাওর জনপদ। এসব হাওর এলাকায় একমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বোরো ফসলকে ধরা হলেও এ ফসল রক্ষায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ প্রতিবছরের ন্যায় নামে মাত্র বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া শেষ করার আগেই অকাল বন্যার কারণে 'ডেকার হাওরে' নির্মিত বাঁধ ভেঙ্গে ফসল তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেনাবাহিনীর একটি দল সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে বাঁধের কাজে ব্যাপক অনিয়মের সন্ধান পান। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ডাকলেও তারা আসেননি। এমতাবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে সেনাবাহিনীর ঐ কর্মকর্তা এবং তার পদস্থরা স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দিন রাত স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ এবং ঝুকিপূর্ণ অংশ মেরামত করেন। এতে করে ঐ হাওরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা প্রায় ৫ হাজার পরিবার অনিশ্চিত জীবন-ধারণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তথ্যসূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০০৮

৮. ***সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান:*** অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ঠিকাদার তাদের পরিচিত কাউকে বাঁধ নির্মাণ কাজটি 'সাব-কন্ট্রাক্ট' বা 'সাব লীজ' দিয়ে দেন। ফলে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার কাজে বরাদ্দ টাকার তুলনায় কাজ কম হওয়া এবং কাজ মানসম্মত হওয়ার সুযোগ কমে যায়। এছাড়াও সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানের সুযোগ থাকায় অ-ঠিকাদাররাও বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে পড়েন। যে কারণে সাব-কন্ট্রাক্ট হাওর অঞ্চলে বেকার যুবকদের মধ্যে একটি মৌসুমী ব্যবসা হিসেবে খুব দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছে। এতে করে বাঁধের মান খারাপ হওয়া এবং বন্যার পানির সামান্য চাপেই তা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণে নির্মিত বাঁধটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সিলেট ও সুনামগঞ্জ অফিসের তদারকির অভাব, লোকবল এবং যন্ত্রপাতির অভাব, পরিবর্তীত জলবায়ূর সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বাঁধ নির্মাণ জ্ঞানের অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেক স্থানে বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি মাটি কাটার সর্দারদের চুক্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে, যার ফলে বাঁধের কাজ খারাপ হওয়ার এবং বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

৪.২ পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার

১৯৬৬ সাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ জনগণের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে টেন্ডার পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন করে। তবে ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ এই দুই বছর টেন্ডার পদ্ধতির পরিবর্তীত পদ্ধতি হিসেবে 'পিআইসি' (Project Implementation Committee) পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন করেছিল। তবে সরকারি বাধ্যবাধকতার কারণে পুনরায় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর থেকে আবারো টেন্ডার পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়ন শুরু করা

হয়। পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপে বেশ কিছু স্টেকহোল্ডার জড়িত। তাদের মধ্যে অন্যতম স্টেকহোল্ডাররা হলেন-

১. পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা/কর্মচারী
২. স্থানীয় ও অস্থানীয় ঠিকাদার
৩. সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে স্থানীয় অ-ঠিকাদার
৪. 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' বা 'পিআইসি'র সদস্যবৃন্দ
৫. মাঠ পর্যায়ে কাজ তদারক করার জন্য নির্ধারিত সুপারভাইজার এবং
৬. মাটি শ্রমিক এবং স্থানীয় জনগণ

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়কাল থেকে পাউবো-সুনামগঞ্জ হাওর অঞ্চলের ফসল রক্ষার্থে বাঁধ নির্মাণ করে আসছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন কারণে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালার পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত পাউবো-সুনামগঞ্জ ৪টি পদ্ধতিতে ফসল রক্ষার ডুবো বাঁধ নির্মাণ করেছে।[২৬] সেগুলো নিম্নরূপ:

১. কাবিখা পদ্ধতি
২. কাবিটা পদ্ধতি
৩. টেন্ডার পদ্ধতি
৪. পিআইসি পদ্ধতি

'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' বা *'কাবিখা'* পদ্ধতিতে স্থানীয় লোকজনকে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ সাপেক্ষে চাউল কিংবা গম বরাদ্দ দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে শ্রমিকরা পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্যের বিনিময়ে কায়িক শ্রম দিতেন। পরবর্তীতে পণ্যের (চাউল এবং গম) পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থার প্রচলণ হয়-যা ***'কাজের বিনিময়ে টাকা'*** বা *'কাবিটা'* নামে প্রচলিত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে *'কাবিখা'* এবং *'কাবিটা'*-এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও পরবর্তীতে সরকারি নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে পদ্ধতিগুলো আর অনুসরণ করা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে যে দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে পাউবো-সুনামগঞ্জ বাঁধ নির্মাণ করেছে সে দুটি পদ্ধতি হচ্ছে **টেন্ডার পদ্ধতি** এবং **পিআইসি** (Project Implementation Committee) পদ্ধতি। তাই আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত: এই দুটি পদ্ধতিকেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

কেস স্টাডি-৪

বাস্তবায়নের পদ্ধতি বদলায় কৃষকের ভাগ্য বদলায় না

সুনামগঞ্জ হাওরের ফসল রক্ষার নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা লুটপাট করছে 'পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা। ফলে প্রতিবছর এসব প্রকল্পে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হলেও হাওরপারের কুষকের ভাগ্য বদলাচ্ছে না। বর্ষা মৌসুমে অকাল বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার লক্ষ্যে ডুবো বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রতিবছর বর্ষা আসার পূর্ব মহুর্তে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সমন্বয়ে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। হাওরপারের মানুষের অভিযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কৃষকের ভাগ্য বদলাচ্ছে না। প্রায় বছরই দেখা যায় ফসল কাটার সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখনই শুরু হয় কমিটির কাজ। যদি কোন কারণে অকাল বণ্যার পানি বাঁধ ডুবিয়ে দেয় তাহলেতো সোনায় সোহাগা। এক্ষেত্রে পুরো বরাদ্দটাই 'কাজ হয়েছে' বলে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন সংশ্লিষ্টরা। এই ঘুর্ণিচক্রেই ঘুরপাক খাচ্ছে হাওরপারের মানুষের বুক ভরা স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'পাগনার হাওরে'র জনৈক কৃষকের মন্তব্য-"কাজ বাস্তবায়নের পদ্ধতি বদলায় কৃষকের ভাগ্য বদলায়না। যদিও এর ফলে জনপ্রতিনিধিদের পকেট ভারি হয়।"

তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক গ্রাম বাংলার খবর , ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং

৪.৩ বাঁধ নির্মাণে টেন্ডার পদ্ধতি এবং সুনামগঞ্জের বাস্তবতা

বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পদ্ধতি হলো *'ঠিকাদারী পদ্ধতি'* বা *'টেন্ডার পদ্ধতি'*। সরকারের পরিবর্তিত নীতিমালা এবং সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালার কারণে যে কোন সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ২০০৩ সাল থেকে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে কাজ প্রদানের নিয়ম চালু করা হয়। তাই বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে যেসব বরাদ্দ আসে সেগুলো খোলা দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়। সরকারের

[২৬] পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনা এই চারটি পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন - কোন কোন বছর স্থানীয় এনজিওগুলো দিয়েও বাঁধ নির্মান করা হতো। কিন্তু এই সূত্রটি পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কর্তৃক সর্মথিত না হওয়ায় গবেষণায় আলোচিত হয়নি।

ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালাকে একটি কাঠামোবদ্ধ রূপদানের লক্ষ্যে 'পিপিআর' বা 'সরকারি ক্রয় নীতিমালা' ঘোষণা করা হয়।[২৭] তথাপিও ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে পরবর্তীতে পদ্ধতি তথা 'পিআইসি' পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। টেন্ডার পদ্ধতির সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো অস্থানীয়দের কাজ পাবার সুযোগ থাকা। ঠিকাদার ঐসব এলাকার ধরণ এবং পানি প্রবাহের তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানেনা। অর্থ্যাৎ তারা হাওর এলাকার সাথে তেমন পরিচিত নন। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঠিকাদাররা সুনামগঞ্জের বাইরের এলাকার এবং তারা স্থানীয় কিছু দালালের মাধ্যমে কাজগুলো সম্পন্ন করার কারণে কাজের মান অত্যন্ত খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

৪.৩.১ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদারদের ভূমিকা

টেন্ডার পদ্ধতিতে বাঁধের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে ঠিকাদার কিংবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো। 'ঠিকাদারী পদ্ধতি' বা 'টেন্ডার পদ্ধতি'তে কাজ করানোর ক্ষেত্রে ঠিকাদার নির্ধারণের জন্য পিপিআর-এ উল্লেখিত নিয়মকানুন মেনে পাউবো-সুনামগঞ্জ কার্যাদেশ প্রদান করে। পিপিআর-এ উল্লেখিত ঠিকাদারদের যেসব যোগ্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হলো-

১. ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে;
২. বৈধ ট্যাক্স আইডেনন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন) থাকতে হবে;
৩. ভ্যাট (VAT) রেজিস্ট্রেশান থাকতে হবে;
৪. এ্যানলিস্টম্যান্ট পত্র (যদি থাকে) থাকতে হবে;
৫. সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে। তবে প্রতিষ্ঠান মনে করলে অভিজ্ঞতার সময়কাল বৃদ্ধি করতে পারবে;
৬. ব্যাংক সিকিউরিটি সংযুক্ত করে দিতে হবে।

উপরোক্ত যোগ্যতাগুলো থাকলেই একজন ঠিকাদার কিংবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। দরপত্রের সাথে উপরোল্লিখিত কাগজপত্রগুলো সংযুক্ত করে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। পরবর্তীতে কাজ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (সাধারণত কাজের মোট টাকার ১০%-২০%) 'সিকিউরিটি মানি' ব্যাংকে জমা রেখে ঠিকাদাররা প্রাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে যায়। বাস্তবায়নে যাওয়ার পূর্বে পাউবো-সুনামগঞ্জের দায়িত্বরত প্রকৌশলীরা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। এ অনুপাতে ঠিকাদাররা বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে কাজ বাস্তবায়ন করে। বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটি কাটার শ্রমিকের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। ঠিকাদাররা স্থানীয়ভাবে শ্রমিকদেরকে সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া বাঁধের নির্দিষ্ট দুরত্ব থেকে (তবে বাঁধের এতো কাছ থেকে

কেস স্টাডি-৫

বাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটি আনায় হুমকীর মুখে হাওরের ফসল

নির্মিতব্য বাঁধের খুব কাছ থেকে মাটি এনে বাঁধ নির্মাণের ফলে মূল আদাং বাঁধই এখন হুমকীর সম্মুখীন। টেন্ডারে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি কমপক্ষে ২০০ গজ দুরত্ব থেকে আনতে হবে এবং তা অবশ্যই 'নদীর বিপরীত দিক' থেকে হতে হবে। কিন্তু সরেজমিনে বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে গিয়ে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। এর ফলে নির্মিতব্য বাঁধ যেমন হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে তেমনি হাওরের ফসলও রয়েছে হুমকীর মুখে। স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায়, এর ফলে খুব সহজেই বাঁধ ভেঙ্গে আশেপাশের গ্রাম প্লাবিত হতে পারে। প্রতিবছরই বাঁধ নির্মাণে এই প্রক্রিয়াগুলো চলে আসছে। গত বছরও একই অবস্থার কারণে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে জানানোর পরও তারা কোন প্রকার উদ্যেগ নেয়নি। বরং পাউবো-সুনামগঞ্জ উত্তরে বললো এটা তাদের দায়িত্ব না ঠিকাদারকে ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে বলে। ঠিকাদারকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, তিনি বাঁধ নির্মাণ করে পাউবো'কে বুঝিয়ে দিয়েছেন কাজেই এখন আর তার কিছুই করার নেই।

তথ্যসংগ্রহ: ১৪ জানুয়ারী, ২০০৯

মাটি কাটা যাবে না যাতে বাঁধের স্থায়িত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়) মাটি সংগ্রহ করার কথা থাকলেও অনেক সময় বাঁধের আশেপাশে প্রয়োজনীয় মাটি পাওয়া যায় না বলে ঠিকাদারদের বেশ কিছু দূর থেকে নৌকা কিংবা ট্রাকযোগে মাটি এনে বাঁধের কাজ করাতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, বাঁধ পুরোপুরি শেষ করার আগেই বন্যা এসে পড়ে। তখন আর বাঁধ নির্মাণ করা যায় না এবং ঐ হাওরের ফসলও আর রক্ষা করা যায়না। তাছাড়া পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে টেন্ডার প্রদানে দেরী এবং কাজের অনুমতি প্রদানে দেরী করাও বাঁধের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া শ্রমিকের প্রাপ্যতার উপরও নির্ভর করে কাজের গতি। দেখা যায়, বাঁধ নির্মাণের উপযুক্ত সময়ে মাটি কাটার জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। জানুয়ারী মাস থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হাওরগুলোতে ধান রোপন করার সময় বলে ঐ সময়ে মাটি কাটার শ্রমিক পাওয়া যায় না, যে কারণে বাঁধের কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ঠিকাদাররা প্রতিযোগীতার মাধ্যমে 'লেস' দিয়ে কাজ নেয়।

[২৭] সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উপরোক্ত ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ সহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন কে পিপিআর বা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস বলা হয়। এটি একটি সু-পরিবর্তনীয় আইন। আইন এবং বাস্তবতার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে প্রতি বছর প্রয়োজন মাফিক আইনটি পরিবর্তন এবং পরিবর্ধণ করা যাবে।

এ কারণে কাজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদাররা অতিরিক্ত 'লেসে' বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের অনুমতি পায় এবং এতে করে কাজের মান খারাপ হয়।

৪.৩.২ টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং প্রতিটি ধাপে বিদ্যমান সমস্যা

সরকারি ব্যয় নীতি অনুযায়ী সরকারি যে কোন ক্রয় কিংবা স্থাপনা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বের কাজগুলো টেন্ডার বা দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। এই দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার একটি সমন্বিত গাইড লাইন তৈরী করে দিয়েছে-যাকে পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট রুলস বা পিপিআর (সরকারি ক্রয় নীতি বা PPR) নামে আখ্যায়িত করা হয়। 'পিপিআর'এ উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী সরকারি দরপত্রগুলো আহ্বান করা হয়-যা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'পিপিআর'এ উল্লেখিত সরকারি যে কোন কাজ করানোর ক্ষেত্রে চারটি ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। নীচে বাঁধ নির্মাণ, পূন:নির্মাণ এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে 'পিপিআর' অনুযায়ী দরপত্র প্রক্রিয়ায় যে চারটি ধাপ রয়েছে এবং প্রতিটি ধাপে যে ধরণের সমস্যা রয়েছে তার একটি সংক্ষেপিত আলোচনা নীচে তুলে ধরা হলো (চিত্র-১)।

চিত্র-১: টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং প্রতিটি ধাপের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

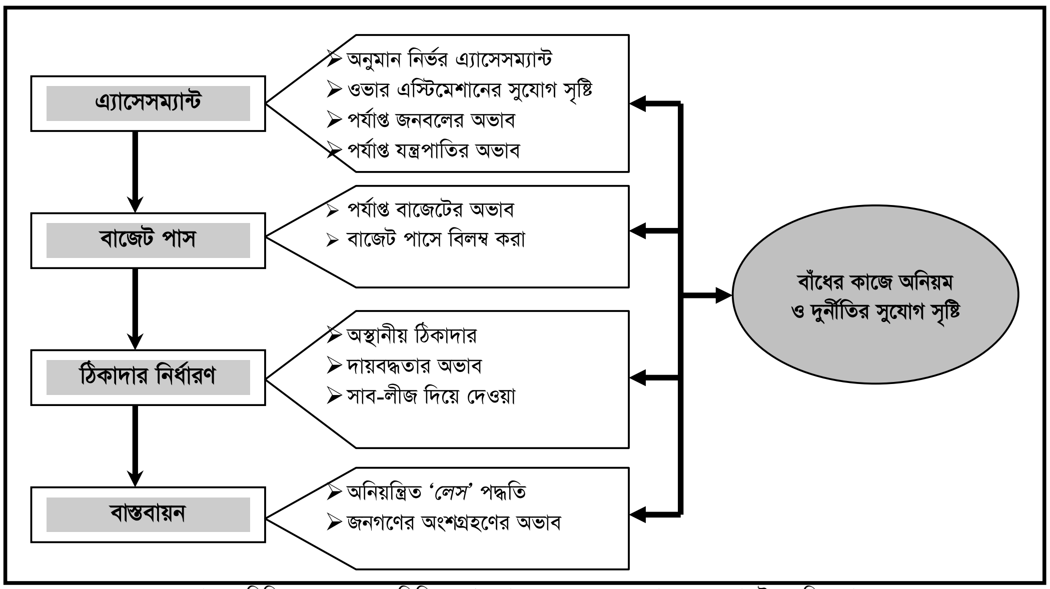

তথ্যসূত্র: পিপিআর-২০০৮, এফজিডি ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।

- ***এ্যাসেসম্যান্ট:*** পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক নিয়োগকৃত এস্টিমেটর দ্বারা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় পাউবো-সুনামগঞ্জের প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরাও জড়িত থাকেন। চলতি বছরের ক্ষয়ক্ষতির সাথে বিগত বছরের বন্যার ধরণ, পানির উচ্চতা, পূর্বের বছরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের সাথে এ বছরের আবহাওয়ার সম্ভাব্য পূর্ভাবাস অনুযায়ী বাঁধের উচ্চতা, ব্যাপ্তি এবং নির্মাণ কৌশলসহ অন্যান্য বিষয়গুলো নির্ধারিত হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বাঁধের স্থায়িত্ব রক্ষার্থে ঘাস দিয়ে কার্পেটিং এবং বাঁশের প্রাচীর কিংবা ব্লক দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারিত হয়। পূর্বের বছরের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এবং বাঁধের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করে কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কারণ যে সময়ে এ্যাসেসম্যান্ট করা হয় সে সময় বেশিরভাগ বাঁধই পানির নীচে থাকে এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঁধের সঠিক অবস্থাটা নিরুপণ করা সম্ভবপর হয়না। এছাড়াও এ্যাসেসম্যান্টের ক্ষেত্রে আরো যে সকল সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো হলো: অনুমান নির্ভর এ্যাসেসম্যান্ট, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, এ্যাসেসম্যান্টের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি।

- ***বাজেট পাস:*** এ্যাসেসম্যান্ট বা কাজের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী এবং সহযোগী কর্মকর্তারা মিলে প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা বাজেট প্রণয়ন করে। এই বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'পিপিআর'এ উল্লেখিত বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রির দাম এবং অনুল্লেখিত বিষয়গুলোর দাম নির্ধারণপূর্বক একটি খসড়া বাজেট প্রণয়ন করেন। বাজেটের খসড়া তৈরীর পর তা অনুমোদনের জন্য সিলেট বিভাগীয় পাউবো অফিসে প্রেরণ করা হয়। পরে সেখান থেকে নির্ধারিত ব্যাজেটটি সরকারি অনুমোদনের জন্য ঢাকাস্থ পাউবো অফিসে প্রেরণ করা হয়। ঢাকাস্থ পাউবো থেকে বিভিন্ন ধরনের বিচার বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদন করা হয় এবং তা সুনামগঞ্জ

জেলা অফিসে প্রেরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ প্রায় ২ মাসের অধিক সময় ব্যায় হয়। এছাড়াও বাজেটের ক্ষেত্রে আরো যে সকল সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায় সেগুলো হলো: হাওর রক্ষা এবং হাওরের পানিজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব, বাজেট প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্ব করা, মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- ***ঠিকাদার নির্ধারণ:*** বাজেট পাসের পর পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক কাজের পুরো বিবরণ দিয়ে জাতীয় দৈনিকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আগ্রহী ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। দরপত্রে ঠিকাদার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিচার্য বিষয় উল্লেখ থাকে। তার মধ্যে ঠিকাদারী লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অন্যতম। ঠিকাদার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো বিদ্যমান সেগুলোর মধ্যে-'পিপিআর' এর কারণে অস্থানীয় ঠিকাদারদের প্রাধান্য, ঠিকাদাররা অস্থানীয় হওয়ায় তাদের দায়বদ্ধতার অভাবসহ আরো বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও প্রধান ঠিকাদার অস্থানীয় হওয়ায় বাঁধের কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সাব-লীজ দিয়ে দেওয়া। এজন্য স্থানীয়ভাবে কিছু অ-ঠিকাদার লোক সাব-লীজ নেওয়াকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

- ***বাস্তবায়ন:*** ঠিকাদারদের যোগ্যতা এবং কাজের অভিজ্ঞতা এবং তাদের 'লেসে'র পরিমাণ দেখে সর্বনিম্ন 'লেস' প্রদানকারীকে কাজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ঠিকাদার জনবল নিয়োগ এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধের কাজ সম্পন্ন করার কথা। এক্ষেত্রে দেখা যায়, অনিয়ন্ত্রিত 'লেসে'র কারণে কাজের মান খারাপ হওয়া এবং শ্রমিকের স্বল্পতাসহ আরো বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান। তাছাড়া দেখা যায়, বাঁধের কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কম হওয়ায় ঠিকাদারদের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত ধাপগুলো অতিক্রম করে 'পিপিআর'র অনুযায়ী সুনামগঞ্জের হাওরের ফসল রক্ষার বাঁধগুলো টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য ১৫০-১৮০ দিন সময় নির্ধারণ করা হয়।[২৮] তবে দরপত্রে উল্লেখিত সময়ের বাইরেও বিশেষ বিবেচনায় নির্বাহী প্রকৌশলী বরাদ্দকৃত সময় আরো কমাতে বা বৃদ্ধি করতে পারেন।[২৯] সব অবস্থা ঠিক থাকলে দরপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজটি শেষ করতে হয়। তবে উপরোক্ত দরপত্রের পুরো প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরী করে দেয়-যা কাজের গুণগতমান এবং স্থায়িত্বকে নষ্ট করার পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে বলে গবেষণা থেকে পাওয়া যায়।

৪.৪ বাঁধ নির্মাণে পিআইসি পদ্ধতি

পরিবর্তনশীল পৃথিবীর উন্নয়ন ভাবনার ক্ষেত্রে 'টেকসই উন্নয়নের' লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করার ব্যাপারে বর্তমানে প্রতিটি পর্যায় থেকে জোড় দাবী উঠছে। সে লক্ষ্যে ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়-যা 'প্রকল্প বাস্তবায়ণ কমিটি' বা 'পিআইসি' নামে পরিচিত। বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের দাবীও সুনামগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের। টেন্ডার পদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যা, হাওরে ফসল রক্ষায় বাঁধের কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়া, হাওর বাস্তবতায় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পূর্বের জারীকৃত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধণ ও সংশোধন পূর্বক "নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৫" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালার অধীনে পিআইসি গঠন করা হয়। নীচে 'পিআইসি'র গঠন, পর্যায়ক্রমিক ধাপ এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৪.৪.১ পিআইসি গঠনের নীতিমালা

হাওর অঞ্চলের বাস্তবতায় 'পিআইসি'র মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে দেয়। প্রতিটি হাওরকে কেন্দ্র করে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' বা 'পিআইসি' কাজ করবে। প্রতিটি 'পিআইসি'র সদস্য সংখ্যা হবে ৭ জন, যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে একজন নারী সদস্য রাখার বিধান রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গ্রাম সরকার এবং পাউবো, সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য রয়েছেন। নীচের সারণি-১১ এ পিআইসি'র গঠন ও সদস্যদের সম্ভাব্য পরিচিতি উল্লেখ করা হলো:

---

[২৮] তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার।

[২৯] তথ্যসূত্র: পিপিআর -২০০৮।

সারণি-১০: 'পিআইসি' সদস্যদের পরিচিতি এবং সংখ্যা

পরিচিতি	পদবী	সংখ্যা
ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য	সভাপতি	১ জন
স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তি	সদস্য	৪ জন (১ জন মহিলা সদস্যসহ)
গ্রাম সরকার প্রতিনিধি	সদস্য	১ জন
ডব্লিএমও প্রতিনিধি	সদস্য	১ জন (নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত)
মোট ৭ জন		

তথ্যসূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড- সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।

'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম সরকার প্রতিনিধি, ডব্লিএমও প্রতিনিধি উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত হবেন। কমিটির প্রত্যেক সদস্য সর্বাধিক ৮ লক্ষ টাকার কাজ করতে পারবে। পিআইসি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে যে কোন রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকে প্রকল্পের জন্য একটি চলতি হিসাব খুলতে হবে এবং এ হিসাব থেকে যাবতীয় লেনদেন করা হবে।[৩০] এতে করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং পাউবো-সুনামগঞ্জের জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে আশা জাগলেও তা বাস্তবতায় রূপ পায়নি। অনেকে মনে করেন টেন্ডার পদ্ধতির মতো বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলোর সাথে সাথে এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতি করার সুযোগ বেড়েছে।

৪.৪.২ পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক ধাপ এবং বিদ্যমান সমস্যা

'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' বা 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে টেন্ডার পদ্ধতির মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তবে টেন্ডার পদ্ধতির মতো এক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন, যোগ্য ঠিকাদার খুঁজে বের করতে হয়না। এছাড়াও দরপত্রের মতো প্রতিযোগীতায় যেতে হয়না। 'পিআইসি' পদ্ধতিতে কমিটির সদস্যরাই সম্মিলিতভাবে কিংবা ভাগ ভাগ করে বাঁধের কাজ করে থাকেন। 'পিআইসি' পদ্ধতির মূল তিনটি ধাপ যথা: (১) এ্যাসেসম্যান্ট, (২) বাজেট পাস, এবং (৩) 'পিআইসি' কর্তৃক বাস্তবায়ন (চিত্র-২)।

'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও পাউবো-সুনামগঞ্জের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে একটি সম্ভাব্য এ্যাসেসম্যান্ট রিপোর্ট জমা দেয়। সে অনুযায়ী বাজেট তৈরী করে সিলেট বিভাগীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাজেট পাস সাপেক্ষে 'পিআইসি' কর্তৃক বাঁধের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। 'টেন্ডার পদ্ধতি'র মতো 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা বিদ্যমান যেমন: এ্যাসেসম্যান্টের ক্ষেত্রে- অনুমান নির্ভর এ্যাসেসম্যান্ট, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাবসহ আরো বেশ কিছু সমস্যা এবং বাজেট পাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব এবং বাজেট পাসে বিলম্ব করা। এছাড়াও 'পিআইসি' কর্তৃক বাঁধের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও আত্মিয়করণ, 'পিআইসি' সদস্যদের নির্মাণ কাজে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবসহ আরো বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান।

চিত্র-২: 'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক ধাপ এবং বিদ্যমান সমস্যা

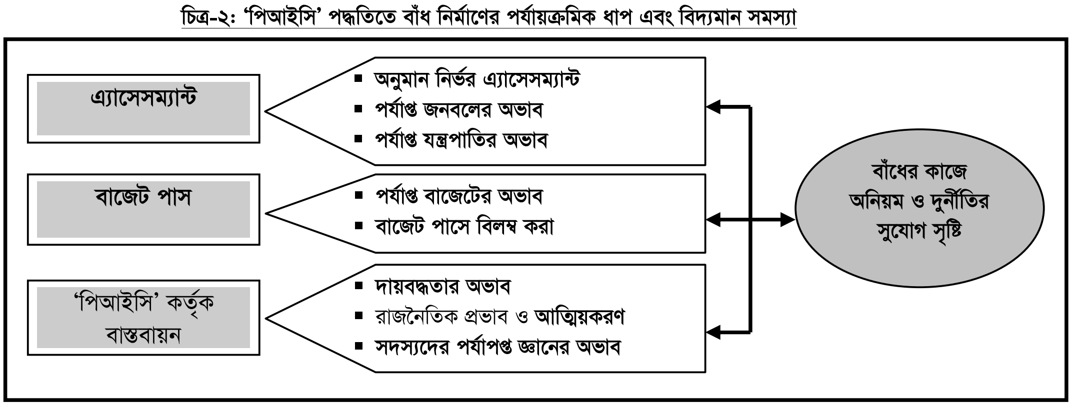

তথ্যসূত্র: এফজিডি ও মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

[৩০] পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত।

৪.৫ বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন

বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন পদ্ধতির (টেন্ডার অথবা পিআইসি) উপর নির্ভর করে স্টেকহোল্ডারদের ধরন পরিবর্তন হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাউবো-সুনামগঞ্জ জড়িত থাকে এবং প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা দেখা যায়। অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ এবং বাস্তবায়নের ধরন পাল্টানোর সাথে অনিয়ম-দুর্নীতি কমবে এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এমনটি আশা করা যায়না। হাওর এলাকাগুলো দুর্গম বিধায় এবং পাউবো-সুনামগঞ্জের জনবল কম হওয়ায় '*পাউবো*' কর্তৃক পরিদর্শন এবং তদারকি করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পাউবো-সুনামগঞ্জ হচ্ছে প্রধান পক্ষ। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, কাজ না করেও বন্যার পানিতে বাঁধ তলিয়ে যাওয়ার পর 'কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে' বলে পুরো টাকাটাই তুলে নেওয়া হয়। ঠিকাদারদের সাথে এ অনিয়মে পাউবো-সুনামগঞ্জের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত থাকে (মূখ্য দল আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। তারা একটি নির্দিষ্ট হারের ঘুষ আদায় করেন।

৪.৬ টেন্ডার পদ্ধতিতে দুর্নীতির ধরন

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে নীচে হাওরে বাঁধ নির্মাণে টেন্ডার পদ্ধতির অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনগুলো আলোচনা করা হলো।

৪.৬.১. ঘুষ আদায়

প্রতিটি কাজের বিপরীতে ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করা হয় এবং ঘুষের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন: বিল তোলার ক্ষেত্রে কমিশনের হার বা ঘুষের হার থাকে এক রকম আবার কাজ সমাপ্ত না করে বিল তোলার ক্ষেত্রে কমিশনের হার থাকে আরেক রকম। তবে যাই বেশিরভাগ ঠিকাদার স্বীকার করেছেন হোক সর্বোচ্চ কাজ হওয়ার পরও কমিশন দিয়েই তারপর ঠিকাদাররা তাদের প্রাপ্ত বিলের ছাড়পত্র পায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক প্রাপ্ত কমিশন বা ঘুষের হার নীচের সারণি-**১১** এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-১১: পাউবো-সুনামগঞ্জের অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক পারসেন্টিজ আদায়ের পরিমাণ

ক্ষেত্র	পারসেন্টিজ-এর পরিমাণ	সংশিষ্ট অফিস
বিল সই করার ক্ষেত্রে	২ - ৫%	র‍্যাক অফিস, সিলেট
কাজের প্রাথমিক/আংশিক বিল তোলার ক্ষেত্রে	১০ - ১৫%	পাউবো, সুনামগঞ্জ
মূল বিল তোলার ক্ষেত্রে	১৫ - ২০%	পাউবো, সুনামগঞ্জ
ভূয়া বিলের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে)	৫০%	পাউবো, সুনামগঞ্জ

তথ্যসূত্র: ঠিকাদার ও পিআইসি সদস্যদের সাথে এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত্ব বিশ্লেষণ।

তাছাড়া প্রতিটি কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে ২-৫% ঘুষ প্রদান করতে হয়। এই হিসেবে প্রতিটি কাজে পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠিকাদার/পিআইসি'র সদস্যদের কাছ থেকে সর্বোনিম্ন ২১.৩% এবং সর্বোচ্চ ২৭.৫% করে পারসেন্টিজ আদায় করে। এক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং পাউবো-সিলেটের বিভাগীয় অফিসের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জড়িত বলে গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়েছে।

৪.৬.২ দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করা

বাঁধের কাজ বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করেই বাঁধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে পুরো টাকা তুলে নেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই স্থানীয় জনগণ দরপত্র অনুযায়ী ঠিকাদাররা বাঁধ নির্মাণ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন। এক্ষত্রে সবচেয়ে বেশী দেখা যায় দুরমুজ না করা এবং ঘাসের আচ্ছাদন না দেওয়া (সারণি-১২)।

সারণি-১২: দরপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার না করার প্রবণতা

উত্তরদাতা	বর্ণনা	শতকরা হার *
স্থানীয় জনগণ	দুরমুজ না করা	৯৪.১
	ঘাস না লাগানো	৮৪.৭
	বাঁশের সেন্টার না দেওয়া	৭৭.৬
	সাইনবোর্ড না লাগানো	৫০.৬
	পর্যাপ্ত মাটি না ফেলা	৪৭.১
*নোট: একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো। এখানে মোট উত্তরের সংখ্যাকে প্রতিটি এককের সাপেক্ষে বিবেচনা করা হয়েছে। মোট উত্তরদাতা = ৪৫ এবং মোট উত্তরের সংখ্যা = ৮৫।		

তথ্যসূত্র: এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত্ব বিশ্লেষণ।

৪.৬.৩ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে বিল উত্তোলন

বিভিন্ন সময়ে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরো কাজ সমাপ্ত না করেই দরপত্রে উল্লেখিত পুরো বিল ঠিকাদার কিংবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো তুলে নেয়। অতিরিক্ত কাজ বা ভেরিয়েশন ওয়ার্কের ক্ষেত্রে এ প্রকার দুর্নীতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণার দেখা গেছে, অনিয়মটির সাথে পাউবো'র এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত এবং তারা

ঠিকাদারদেরকে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের অনিয়ম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে যতটুকু কাজ হয়নি তার অর্থ মূল্য পাউবো-সুনামগঞ্জ ও ঠিকাদার কিংবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হয়ে যায়। এছাড়াও ভেরিয়েশন বা ইমার্জেন্সি কাজের কথা বলে ভুয়া বিলের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত করার মতো অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গিয়েছে।

৪.৬.৪ ওভার এস্টিমেশন

হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক এস্টিমেশনের সময় ওভার এস্টিমেশন করা অনেকটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। গবেষণার দেখা গেছে, গড়ে প্রায় ৩১৪.৫ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিসের ওভার এস্টিমেশন করা হয়েছে। ওভার এস্টিমেশনের ক্ষেত্রেও কয়েকটি ধরণ রয়েছে। পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক ওভার এস্টিমেশনের ধরণ এবং তাদের ব্যাপ্তি নীচে আলোচনা করা হলো-

ক. ***মাপের ক্ষেত্রে:*** এক্ষেত্রে দেখা যায় বাঁধের প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ অংশের চেয়ে মাপে বেশি ধরা হয়। এর মধ্যে বাঁধ নতুন করে নির্মাণ, পুরাতন বাঁধ সংস্কার ইত্যাদিও পড়ে। ডুবো বাঁধ নির্মাণের মধ্যে প্রায় প্রতিটির ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্থ অংশের বা নির্মিতব্য অংশের তুলনায় প্রায় দ্বি-গুন এস্টিমেশন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদাররা কাজ করানোর সময় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশের কাজটুকুই করে।

খ. ***নির্মাণ উপকরণের দামের ক্ষেত্রে:*** বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণকারী ঠিকাদার কিংবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো উপকরণগুলো স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক নির্ধারিত উপকরণের পরিমাণ এবং গুণগতমানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিটি উপকরণেরই গড়ে প্রায় ৩৩৭.৭ শতাংশ অধিক মূল্য নির্ধারণ করে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ মাটি এবং বাঁশের স্থানীয় বাজারদর এবং দরপত্রে উল্লেখিত দরের মধ্যে অসামাঞ্জস্যগুলো তুলে ধরা হলো:

সারণি-১৩: বাঁশ এবং মাটি/ শ্রমিকের ক্ষেত্রে পাউবো সুনামগঞ্জ কর্তৃক ওভার এস্টিমেশন

উপকরণ	দরপত্রে উল্লেখিত দর	স্থানীয় দর*	গড় ওভার এস্টিমেশন (%)
বাঁশ	১৩০ টাকা (প্রতি খন্ড)	৪০-৫০ টাকা (প্রতি খন্ড)	২৮৮.৯%
মাটি/ শ্রমিক (প্রতি হাজার ঘণফুট)	৪,০০০-৪,৫০০ টাকা	১,০০০-১,৫০০ টাকা	৩৮৬.৪%
****নোট: উপরে উল্লেখিত দর গবেষণা সময়কালে স্থানীয় বাজার থেকে প্রাপ্ত। তবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে এই দর বাড়তে কিংবা কমতে পারে এবং সে অনুযায়ী ওভার এস্টিমেশনের শতকরা হারও কম কিংবা বেশী হবে।***			

তথ্যসূত্র: এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, স্থানীয় বাজার থেকে বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণের দাম মূল্যায়ণ।

এছাড়াও পাউবো-সুনামগঞ্জ আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে ওভার এস্টিমেশন করে থাকে, সেগুলো হলো: বাঁধের উচ্চতা, পরিধি, মাটি প্রাপ্তির দূরত্ব এবং মাটি পরিবহণ ইত্যাদি। এর ফলে, ঠিকাদারদের ৫০ শতাংশের উপরে 'লেস' দিয়েও লাভবান হওয়ার জোড় সম্ভাবনা থাকে।

৪.৬.৫ ভেরিয়েশন বা ইমার্জেন্সি কাজের নামে দুর্নীতি

বন্যা শুরুর প্রক্কালে হাওরের ফসল রক্ষার্থে মূল কাজের বাইরেও আরো বেশ কিছু অতিরিক্ত কাজ করাতে হয়, যাকে 'পিপিআর-২০০৮' এর ভাষায় 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক'[৩১] বা 'ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক' নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় প্রতি বছরই পাউবো-সুনামগঞ্জ এই 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' বা 'ইমার্জেন্সি কাজ' করাতে হয়। 'পিপিআর-২০০৮' এর বিধি-বিধানের কারণে মূল কাজ যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান করেছে তাদেরকে দিয়েই এই 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' বা 'ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক' এ কাজগুলো করানো হয়। একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক'-এ কার্যাদেশ প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতিগুলোর চিত্র তুলে ধরা হলো।

উল্লেখিত ফ্লো চার্ট-৩ এ দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি ধাপেই পাউবো, সুনামগঞ্জ এবং ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'পিআইসি' বা 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' কর্তৃক 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা কম থাকলেও অনেক সময় পাউবোর এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী পিআইসি'র

[৩১] *'পিপিআর -২০০৮'* অনুযায়ী 'বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তনজনিত কারণে কার্যের সংযোজন বা বিয়োজন, প্রকল্পের সাধারণ ব্যাপ্তি ও ভৌত সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে, কার্যের নূতন আইটেম অন্তর্ভুক্তিসহ পরিমাণগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ক্রয়কারী মূল ঠিকাদারের নিকট হতে কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য ভেরিয়েশন অর্ডার জারী করতে পারে।' এছাড়াও উল্লেখ থাকে যে, 'ক্রয়কারী, প্রকল্প এলাকার ভূ-গর্ভস্থ অথবা প্রচ্ছন্ন ভৌত অবস্থা চুক্তিতে বর্ণিত অবস্থা হতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হওয়ার কারণে, অথবা সাধারণভাবে চুক্তির সংস্থান মোতাবেক প্রত্যাশিত বা স্বীকৃত নয় প্রকল্পস্থলের এইরূপ অজ্ঞাত এবং অস্বাভাবিক ধরনের ভৌত অবস্থার কারণে মূল কার্যের সমাপ্তি, উন্নতিবিধান অথবা সংরক্ষণের প্রয়োজনে মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এইরূপ কোন নূতন কার্যের জন্য অতিরিক্ত কার্যাদেশ জারী করতে পারবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলা পিপিআর-২০০৮ এর মতে, ভেরিয়েশন অর্ডার এর ক্রমপুঞ্জিত মূল্য তফসিল-২ এ উল্লিখিত সীমার অতিরিক্ত হলে এবং উক্তরূপ কার্য মূল চুক্তি হইতে আলাদা করা সম্ভব হলে, উহার জন্য দরপত্র আহ্বান করে পৃথক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত কার্য সম্পাদন করতে হবে।

সদস্যদেরকে 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র অবহিতকরণ এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণে বাধ্য করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিমত হলো, যেহেতু বাঁধ পানির নীচে থাকা অবস্থায় তাদেরকে এস্টিমেশন করতে হয় সেহেতু বাঁধের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব হয় না। ফলে তাদেরকে পরবর্তীতে 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত করতে হয়।

চিত্র-৩: 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র বিভিন্ন ধাপ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির ফ্লো-চার্ট

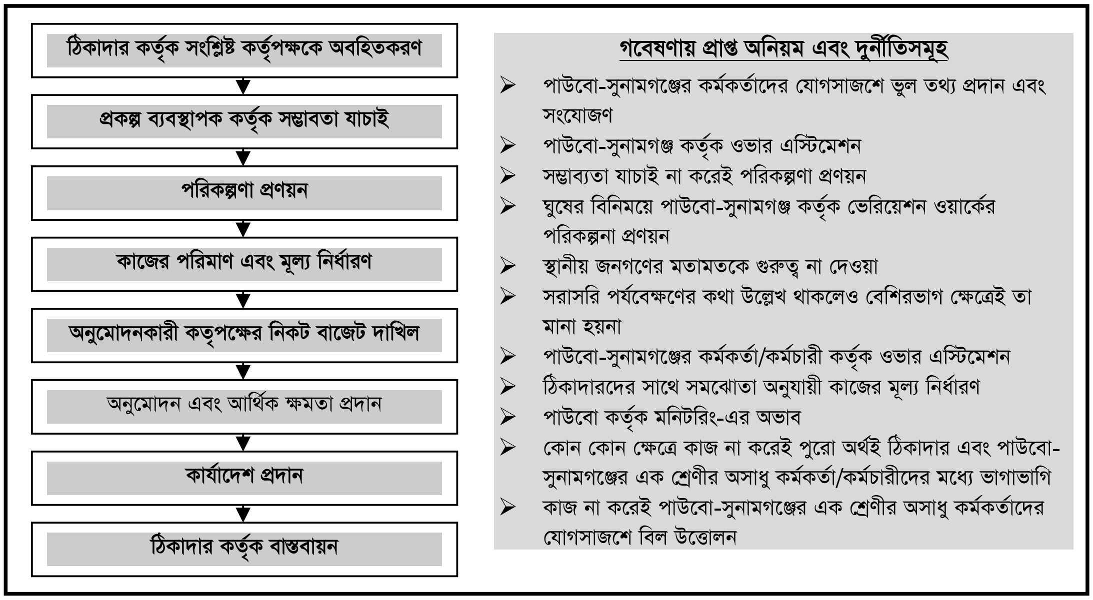

তথ্যসূত্র: 'পিপিআর-২০০৮', বিভিন্ন পর্যায়ের এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

৪.৬.৬ মনিটরিং বা তদারকিতে দুর্নীতি

হাওর রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং সরকারের পানি সম্পদকে সুষ্ঠ তদারকির মাধ্যমে জনকল্যানে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ শুধুমাত্র সুষ্ঠ তদারকির অভাবে ভাটি এলাকা নামে খ্যাত সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার বিপুল জলরাশি এবং জলজ সম্পদ আজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন এবং তদারকির দায়িত্ব পাউবো-সুনামগঞ্জের উপর ন্যাস্থ। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে পাউবো, সুনামগঞ্জের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী বাঁধ নির্মাণ, তদারকির অজুহাতে প্রায় প্রতিটি ঠিকাদার/পিআইসি থেকে ঘুষ আদায় করে মনগড়া রিপোর্ট প্রদান করে। ঠিকাদার, স্থানীয় জনগণ এবং সুশীল সমাজের সাথে দলীয় আলোচনায় পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক মনিটরিং-এর নামে যে অনিয়ম এবং দুর্নীতিগুলো সংগঠিত হয় সেগুলো নীচে সারণি-১৪ এ উপস্থাপিত হলো-

সারণি-১৪: পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক কাজ 'মনিটরিং' এ অনিয়ম এবং দুর্নীতি

উত্তরদাতা	চিহ্নিত অনিয়ম দুর্নীতি	শতকরা হার	ঘুষের হার
ঠিকাদার, পিআইসি, স্থানীয় জনগণ ও সুশীল সমাজ	ঘুষ আদায়	৬৮.৪%	সর্বনিম্ন - ২০০ টাকা সর্বোচ্চ - ১২০০ টাকা
	যাতায়াত খরচ বাবদ অর্থ দাবী	৬০.৫%	
	ভূল তথ্য সংযোজণ করা	৫৩.৯%	
	সরাসরি পর্যবেক্ষণ না করেই প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪২.১%	
	ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে বিল আটকানোর হুমকী	৪০.৮%	
	মনগড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩১.৬%	
	অন্যান্য	১৩.২%	
পাউবো-সুনামগঞ্জ	লোকবলের অভাব হেতু সব সময় 'মনিটরিং' সম্ভব হয়না	২৫.০%	
	যানবাহনের অভাবের কারণে দুর্গম এলাকায় 'মনিটরিং' করা সম্ভব হয়না	২২.৪%	
	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ 'পার্সেন্টেজ' আদায়ে বাধ্য করে	৫.৩%	
নোট: একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিমাণ ছিল ২৭৬টি এবং নমুনার আকার ছিল মোট ৭৬ জন। যেখানে পাউবো কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিলেন ২০ জন।			

তথ্যসূত্র: ঠিকাদার, পাউবো কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থানীয় জনগণ ও সুশীল সমাজের সাথে এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ব বিশ্লেষণ।

উপরোক্ত সারণি-১৫ এ চিহ্নিত সমস্যাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মনিটরিং-এর নামে আরো বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি সংগঠিত হয়। সেগুলোর মধ্যে: সরেজমিনে না গিয়ে ফোনের মাধ্যমে তদারকি, বিভিন্ন সময়ে পাউবো-সুনামগঞ্জের

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জোড়পূর্বক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা অন্যতম। এক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা গেছে ঠিকাদার বা পিআইসি সদস্যদেরকে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছিল।

৪.৬.৭ ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতি

গবেষণার (এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য) দেখা গেছে, প্রায়শই পাউবো-সুনামগঞ্জের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। ঠিকাদাররা এবং পিআইসি'র সদস্যরা অভিযোগ করেন, পার্সেন্টিজ না দিলে বা পাউবো-সুনামগঞ্জের ঐসব অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ না করলে ঠিকাদারদের বিল আটকানো এবং সময়মত বিল না দেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের হায়রানি এবং হুমকী দেওয়া হয়। এছাড়াও পরিচিত ঠিকাদারদের কাজ প্রদান কিংবা কাজ পেতে সাহায্য করা এবং কাজ পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করা অন্যতম। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে যেহেতু কার্যাদেশ দেওয়ার বিধান রয়েছে সেহেতু দেখা যায় পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ট লোকজনকে সর্বনিম্ন দর কত হয়েছে এবং কত পর্যন্ত 'লেস' দিলে তারা লাভ করতে পারবে তা দরপত্র জমাদানের পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়।

কেস স্টাডি-৬
নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ব্যক্তিগত পছন্দ ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত তিন বছর ধরে পাউবো-সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলীর নজিরবিহীন দুর্নীতি শুরু হয়। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যক্তিগত পছন্দের ঠিকাদারকে একতরফাভাবে কার্যাদেশ দিয়ে আলোচনায় আসেন। সর্বনিম্ন যোগ্য দরদাতাকে কার্যাদেশ দিয়ে যেখানে সরকারি অর্থের সাশ্রয় করার কথা সেখানে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে কার্যাদেশ গ্রহণ করে সরকারি অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় নিয়ম শৃঙ্খলাকেও পদদলিত করেছেন। বিনিময়ে প্রহসনের কাজ হাতিয়ে নেওয়া ঠিকাদারদের কাছ থেকে তিনি উৎকোচ নেন বিপুল পরিমান অর্থ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের টেন্ডার কার্যক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদেরকে কিছু না জানিয়েই একতরফাভাবে নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে 'ওয়ার্ক অর্ডার' দেন। ফলে বাধ্য হয়ে অধিকার বঞ্চিত ২৩ জন ঠিকাদার ঐ দুর্নীতির বিরুদ্ধে "সুনামগঞ্জ পাউবো বিভাগ কর্তৃক টেন্ডার নং ০১/২০০৬-২০০৭ এর লট নং ০১-০৬ পর্যন্ত কাজের ব্যাপক অনিয়ম প্রসঙ্গ" *শিরোনামে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঐ অভিযোগে উল্লেখ করা হয় নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যাদের নুন্যতম উপযুক্ততা নেই সেসব ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা তাই এর প্রতিকার চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বরাবরে তুলনামূলক বিবরণী প্রেরণ করেছিলেন।*

তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক গ্রাম বাংলার কথা; সুনামগঞ্জ, ৪ মার্চ ২০০৭ ইং

পাউবো, সুনামগঞ্জের ন্যায় ঠিকাদাররাও বাঁধ নির্মাণ বা সংস্কারের কাজে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে হাওরের বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক যে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি সংগঠিত হয় সেগুলো হলো-

সারণি-১৫: ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধ নির্মাণে সংগঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ

ক্রমিক নং	ঠিকাদার কর্তৃক সংগঠিত অনিয়ম ও দুর্নীতি
১	দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করা/টেন্ডারে বর্ণিত নির্মাণ সামগ্রি ব্যবহার না করা
২	অতিরিক্ত লাভের আশায় কাজের ব্যাপ্তি কমিয়ে দেওয়া
৩	পাউবোর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যোগসাজশে কাজ না করেও পুরো টাকা উত্তোলন
৪	কাজ পাওয়ার পর ঠিকাদার নিজে কাজ না করে সাব-লীজ দিয়ে দেওয়া
৫	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত না করা এবং ভুয়া কাগজ পত্র সংযুক্ত করা
৬	নানন ধরনের অজুহাত দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে কাজ শুরু করা, যাতে পুরো কাজ শেষ হওয়ার আগেই বন্যার পানি পড়লে কাজ না করেও পুরো টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকে
৭	দরপত্রে উল্লেখিত দুরত্ব থেকে মাটি না এনে বাঁধের নিকটবর্তী স্থানের মাটি ব্যবহার করা
৮	প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে মাটি শ্রমিক বেশী দেখানো
৯	বাঁধ নির্মাণের পূর্বে ঘাস না কাটা, দুরমুজ ব্যবহার না করা এবং বাঁধ নির্মাণের পরে তাতে ঘাসের কার্পেটিং না করা

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পর্যায়ে এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

উপরোক্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বাঁধের স্থায়িত্ব সবসময় হুমকির সম্মুখীন থাকে এবং পাহাড়ি ঢলের পানির চাপে বাঁধ টেকানো সম্ভব হয়না। ঐ সময়ে ঠিকাদারদের কাউকেই এলাকায় পাওয়া যায় না। দলীয় আলোচনা, মূখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শুধুমাত্র যে বছর বন্যার তীব্রতা কম ছিল সেই বছরই হাওরের ফসল রক্ষা হয়েছে। এতে নির্মিত বাঁধের কোন ভূমিকা নেই বলে স্থানীয় জনগণ মতামত দিয়েছেন।

৪.৭ পিআইসি পদ্ধতিতে অনিয়ম দুর্নীতির ধরন

হাওরের ফসল রক্ষার্থে বাঁধ নির্মাণে পিআইসি পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা যেমন রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এ পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। পাশাপাশি অল্প টাকায় ভালো কাজ করানোর সুযোগও রয়েছে বলে স্টেকহোল্ডাররা মনে করেন। তবে পিআইসি পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যদের অনভিজ্ঞতা। গবেষণায় টেন্ডার পদ্ধতির ন্যায় এই পদ্ধতিতেও কিছু অনিয়ম-দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলোঃ

১ ঘুষ আদান-প্রদান
২ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রকৃত বরাদ্দ ও ব্যয় সম্পর্কে অবহিত না করা
৩ স্থানীয় জনগণকে ব্যয় এবং কাজ সম্পর্কে অবহিত না করা
৪ নতুন মধ্যস্বত্ত্বভোগী এবং সুবিধাভোগী তৈরী
৫ দুর্নীতির ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা

উপরোক্ত অনিয়ম-দুর্নীতিগুলো ছাড়াও কমিটির নারী সদস্যদের অংশগ্রহনে বাঁধা সৃষ্টি করা, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সময়মত পরিশোধ না করা, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো, আত্মিয়কীকরণ, জোড়পূর্বক গরীব চাষীদের জমি থেকে মাটি কাটা, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। নীচে পিআইসি পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম ও দুর্নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

৪.৭.১ ঘুষের আদান-প্রদান

টেন্ডার পদ্ধতির মতো 'পিআইসি' পদ্ধতিতেও সংশ্লিষ্ট 'স্টেকহোল্ডারদের' মধ্যে ঘুষ আদান-প্রদান একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়। টেন্ডার পদ্ধতির মতো কাজ পাওয়ার জন্য পাউবো-সুনামগঞ্জের অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন না হলেও বিভিন্ন সময়ে বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট হারে পাউবো-সুনামগঞ্জের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিতে হয়। কাজের ধরন অনুযায়ী ঘুষের হারও নির্ধারিত হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাঁধের কাজগুলো করা হয় বলে জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার কারণে পিআইসি সদস্যরা টেন্ডার পদ্ধতির তুলনায় সঠিকভাবে কাজ তুললেও বিল ছাড়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে ঘুষ প্রদান করেই কাজের বিল উত্তোলন করতে হয়।

৪.৭.২ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রকৃত বরাদ্দ এবং ব্যয় সম্পর্কে অবহিত না করা

'পিআইসি' পদ্ধতির বড় একটি সমস্যা হলো বাঁধের কাজের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরা (যারা বাস্তবায়ন কাজে সরাসরি জড়িত) কাজের প্রকৃত বরাদ্দ, ব্যয় এবং ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অধিকাংশ (যেমনঃ স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলা সদস্যদের) অন্যান্য সদস্যদেরকে অবহিত করা হয়না। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত হয়না বলে অনেক সদস্যই অভিযোগ করেছেন।

৪.৭.৩ স্থানীয় জনগণকে ব্যয় এবং কাজ সম্পর্কে অবহিত না করা

'পিআইসি' পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় জনগণকে কাজের ব্যাপ্তি, ব্যয় এবং ফলাফল সম্পর্কে অভিহিত করা হয়না। ফলে স্থানীয় জনগণ তাদের সম্পৃক্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে। গবেষণায় স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা গেছে, টেন্ডার পদ্ধতি ছাড়াও দুটি বছর যে ইউপি সদস্যদের নিয়ে গঠিত পিআইসি পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁধের কাজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তারা পূর্বে অবগত ছিলেননা।

৪.৭.৪ নতুন সুবিধাভোগী এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগী তৈরি

'পিআইসি' পদ্ধতিতে অধিকাংশ কমিটির সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা হওয়ায় এবং তাদের ওপর ইউপি চেয়ারম্যানের প্রভাব থাকায় পিআইসি পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে একটি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে তার পাউবোর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পিআইসি কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবদের মধ্যে পার্সেন্টিজের পরিমাণ নির্ধারণে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৪.৭.৫ দুর্নীতির ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা

'পিআইসি' পদ্ধতিতে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বাররা সভাপতি হবার পাশাপাশি অন্যান্য সদস্যদের স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে, পাউবো-সুনামগঞ্জের অসাধু কর্তৃপক্ষের অনিয়ম-দুনীতির যে চর্চা তার সাথে কমিটির কিছু সদস্যের যুক্ত থাকার পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার একটি অংশ হয়ে উঠে। তাই বলা যায়, 'পিআইসি' পদ্ধতিতে দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাউবো-সুনামঞ্জের অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'পার্সেন্টিজ' দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুক্ত হওয়াসহ বাঁধ নির্মাণের কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে আর্থিক

ভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। ফলাফলস্বরূপ, পিআইসি পদ্ধতিও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

কেস স্টাডি-৭

'মানত' বলে কথা-চাঁদা তুলে পাউবো'র মিলাদ-মাহফিল

পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ অফিসের সামনে বড় পুকুরের পূর্ব পাড়ে বিশাল প্যান্ডেল ও ভিতরে একটি মঞ্চ। কয়েকজনকে নিয়ে মঞ্চে বসা পাউবো, সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী। মঞ্চের সামনের চেয়ারে পাউবো'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদারসহ কয়েকশ লোক। গত ৬ ফেব্রুয়ারী জুমার নামাজের পর মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের বিশাল আয়োজন করেন নির্বাহী প্রকৌশলী নিজেই। শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের চিঠি পাঠিয়ে দাওয়াত করেন নির্বাহী প্রকৌশলী।

বিশাল আয়োজনের নেপথ্যের কারণ হচ্ছে গতবছর অকাল বন্যার হাত থেকে সুনামগঞ্জ হাওরের ফসল রক্ষা এবং এবারও যাতে রক্ষা পায় তার জন্য লাখ টাকা ব্যয়ে 'মিলাদ ও দোয়া' মাহফিল। নির্বাহী প্রকৌশলী নিজেই বলেছেন এটি তার 'মানত' ছিল। তবে নিজের টাকায় নয় 'মানত' পালন করেছেন ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে। প্রায় ৬০০ লোকের আয়োজনে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক লক্ষ টাকা। 'মানত' আয়োজনে টাকা দিয়েছেন এমন একজন ঠিকাদার বলেন 'আমি একা নই, আমাদের সকলের কাছ থেকেই টাকা নেওয়া হয়েছে। তবে আমরা ইচ্ছে মতো টাকা দিয়েছে। এই সহযোগীতা কাজে লাগবে মনে করেও কেউ কেউ টাকা দিয়েছেন।'

চাঁদা তুলে 'মানত' পূরণ করা সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন 'অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে ঠিকাদার সকলেই তাদের ইচ্ছে মতো সহযোগিতা করেছেন। কারো কাছে টাকা দাবী করিনি। এটি আমার ব্যক্তিগত 'মানত' ছিল।'

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

এছাড়াও আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিভিন্ন অজুহাতে ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, ঠিকাদারদের প্রদেয় 'লেসে'র পরিমান পরিচিত ঠিকাদারদের জানিয়ে দেওয়া, নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে 'পিআইসি' গঠন না করা, পিআইসি'র অন্যান্য সদস্যদের বাস্তবায়িত কাজ এবং ব্যয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না করে কাজ বাস্তবায়ন, জনগণকে কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না করা এবং যুক্ত না করা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতের মধ্যে পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন খাত অন্যতম। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তার কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং একটি স্বতন্ত্র বোর্ডের মত সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রতিটি কাজের প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় অবস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিসগুলো স্ব-স্ব কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে পাউবো-সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা নিজস্ব জনবল দ্বারা হাওর এলাকার পানি সম্পদকে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরী সম্পদে পরিণত করেছেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটিও পিপিআর'এ উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাঁধ নির্মাণ বা পূণ:নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। তবে হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেকটা অনুমান নির্ভর হয়ে থাকে। কেননা যে সময়ে কাজের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ঐ সময় হাওর এলাকা জলমগ্ন থাকে। তাই পাউবো'র প্রকৌশলীরা অনুমান নির্ভর একটি খসড়া 'এস্টিমেশন' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজের ব্যাপ্তী নির্ধারণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাওর এবং জলাভূমিগুলো এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব হাওর এবং জলাভূমিগুলোকে শস্য ভান্ডার এবং মৎস্য সম্পদের আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের প্রায় ২৫০ প্রজাতির মৎস্যের মধ্যে ১৫০টির মতো শুধুমাত্র হাওর এলাকায় দেখা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে হাওরবাসী জনগণ অতিমাত্রায় হাওরের উপর নির্ভরশীল। এজন্য বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পুরোপুরি সফল হয়নি। হাওরবাসীদের প্রতিটি কর্মকান্ড যেমন হাওর কেন্দ্রিক তেমনি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড একটি আরেকটির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শুধু বিচ্ছিন্নভাবে হাওরবাসীর উন্নয়নের দিকে নজর না দিয়ে প্রতিটি পর্যায়েই একসঙ্গে নজর দেওয়া জরুরী।

পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত হাওর রক্ষার জন্য যেসব উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তার মধ্যে হাওরের ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, হাওরের একটি মাত্র ফসলের উপরই হাওরবাসী জনগনের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আবর্তিত হয়। কিন্তু অপরিকল্পিত বাঁধ, স্লুইচ গেইট নির্মাণ, নদীর গতিপথে বাঁধা সৃষ্টি প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে আজ হাওর জেলা নামে খ্যাত সুনামগঞ্জের জনগণের জীবনমান হুমকীর মুখোমুখী। সরকারি নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং সমন্বয়হীনতা হাওরের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অধ্যায়ে হাওর উন্নয়নে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিতর যে সকল দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো রয়েছে তার গভীরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর ফলাফলকে বিবেচনায় নিয়ে যেন একটি যুগোপযোগী সুপারিশমালা প্রণয়ন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৫.১ বাঁধ ভাঙ্গার কারণ

হাওর রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের পদ্ধতিটি 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক ধার্যকৃত তথাপিও এর অর্থ ব্যয়ের সম্পূর্ণ এখতিয়ার পানি উন্নয়ন বোড-সুনামগঞ্জের হাতে। বিভিন্ন সময়ে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড' নামে মাত্র তদারকীর দায়িত্ব পালন করে। বাঁধের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাঁধ নির্মাণকারী ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের উদ্যেগ নেওয়ার কথা থাকলেও তারা সে কাজটি না করে শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণ শেষ করেই তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেয়।

হাওর এলাকার বাঁধগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে বর্ষা মৌসুমে বাঁধগুলো পানি আটকিয়ে রাখতে পারেনা বা পানির নীচে ডুবে যায়। কারণ, তা না হলে বাঁধের উপর দিয়ে প্রবহমান বিশাল জলরাশি ধারণ করার মতো নদীর পর্যাপ্ত নব্যতা নেই। তাছাড়া হাওর-বাওরগুলো হলো মৎস্য সম্পদের অবাদ বিচরণক্ষেত্র। তাই মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও বাঁধগুলো ভেঙ্গে দিতে হয়। এছাড়া হাওর এলাকায় সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হলো: নৌপথ। বর্ষা মৌসুমে পুরো এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়লে হাওর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই স্থানীয় জনগণ ফসল উঠে যাওয়ার পর যোগাযোগের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে বাঁধ কেটে দেয়।

উপরোক্ত কারণগুলো বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচণায় রেখে বাঁধ কেটে দেওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা হলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাঁধ টিকে থাকাটা জরুরী। মূলত: ফসল কাটার সময়টাই বাঁধ টিকিয়ে রাখার মূল সময় হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হলেও ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে এর তেমন কোন কৃতিত্ব নেই। বরং যে বছর অকাল বন্যার মাত্রা কম থাকে বা একবারেই থাকে না সে বছরই কেবল কৃষকরা তাদের ফসল ঘরে তুলতে পারে। তাই গবেষণায় বাঁধ ভাঙ্গার কারণগুলো বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ারর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। নীচে একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে গবেষণায় বাঁধ ভাঙ্গার কারণ হিসেবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত তুলে ধরা হলো-

চিত্র - ৪: বাঁধ ভাঙ্গার কারণ সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ফ্লো-চার্ট

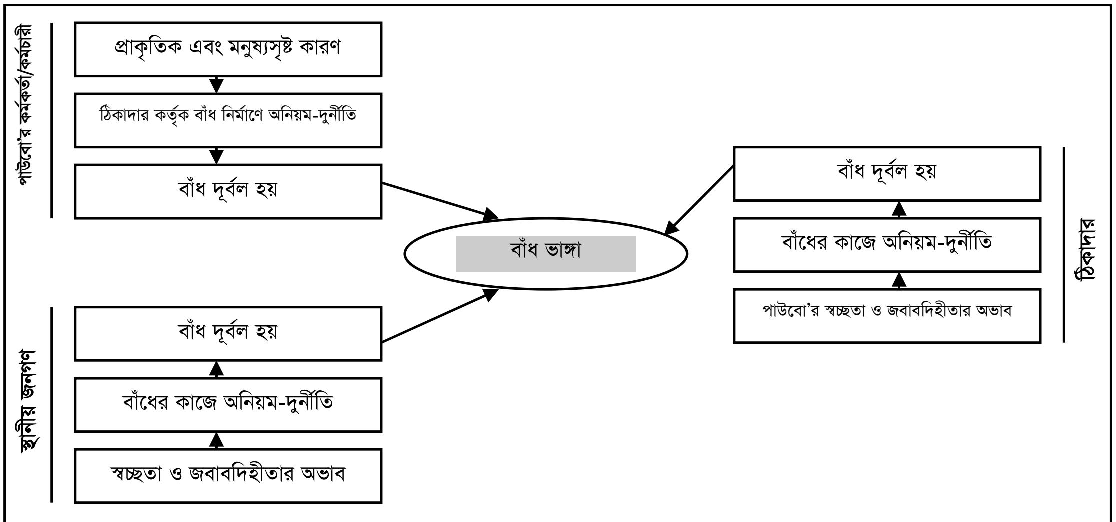

তথ্যসূত্র: এফজিডি এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

এছাড়া বাঁধ ভাঙ্গার কারণ হিসেবে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আরো বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বাঁধ ভাঙ্গার কারণ হিসেবে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন, যার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো উপরের ফ্লো-চার্ট-৪ এ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পাউবো'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, ঠিকাদার এবং সাধারণ জনগণের বাঁধ ভাঙ্গার মতামতগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়-

সারণি-১৬: বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কর্তৃক প্রদত্ত বাঁধ ভাঙ্গার কারণ।

স্টেকহোল্ডার	বাঁধ ভাঙ্গার কারণ	শতকরা হার (%)	ফলাফল
পাউবো'র কর্মকর্তা/কর্মচারী	প্রাকৃতিক	৪৫.৩২	বাঁধ দুর্বল হয় এবং অকাল বন্যার পানির চাপে ভেঙ্গে গিয়ে ফসলহানী ঘটায়
	মনুষ্যসৃষ্ট কারণ	৩৩.৩০	
	ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতি	২১.৩৮	
স্থানীয় জনগণ	বাঁধের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার অভাব	৪৩.৮০	
	পাউবো এবং ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধের কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি	৫৬.২০	
ঠিকাদার	বাজেটের স্বল্পতা	২৭.৩০	
	অনিয়ন্ত্রিত লেস ও জবাবদিহীতার অভাব	৪৫.৫০	
	পাউবো এবং ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধের কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি	২৭.৩০	

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পর্যায়ে এফজিডি এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

- ***পাউবো:*** বেশিরভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন বাঁধ ভাঙ্গার প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত: প্রাকৃতিক কারণ এবং দ্বিতীয়ত: মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। পাউবো'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মতে প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-পানির প্রবাহ এতো বেশি থাকে যে বাঁধ সেটা আটকাতে পারেনা। তাছাড়া অনেক সময় বাঁধ পুরো তৈরী হওয়ার আগেই বন্যার পানি বা অকাল বন্যার পানির তোড়ে বাঁধ ভেঙ্গে হাওর তলিয়ে যায়। এছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে পাউবো'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মনে করেন: ঠিকাদাররা নিম্ন মানের বাঁধ নির্মাণ করে যা অকাল বন্যার পানি আটকিয়ে রাখতে পারে না। অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য মানুষ বাঁধ কেটে দেয়।

- ***স্থানীয় জনগণ:*** প্রায় সব উত্তরদাতাই স্বীকার করেছেন বাঁধ নির্মাণের বরাদ্দ এতো কম থাকে, যে কারণে বাঁধের কাজের মানও হয় নিম্ন। বাঁধ নির্মাণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতার অভাব ও বাঁধ নির্মাণকারী ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসহ পাউবো'র কর্মকর্ত/কর্মচারীদের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি বাঁধের মান খারাপ করে দেয়। ফলাফলস্বরূপ বাঁধ টেকসই হয়না এবং বাঁধ ভেঙ্গে হাওরের হাজার হাজার একর জমির ফসল পানির নীচে তলিয়ে যায়।

- ***ঠিকাদার:*** বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাঁধ ভাঙ্গার কারণ হিসেব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষেও জবাবদিহীতার অভাবকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করেছেন। এছাড়াও তারা মনে করেন

বাজেট বরাদ্দ কম এবং অনিয়ন্ত্রিত 'লেস' পদ্ধতির কারণে ঠিকাদাররা বাধ্য হয়ে খরচ বেশী করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে পারেন না। এছাড়াও ঠিকাদাররা মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক (পাউবো) অনিয়ম এবং দুর্নীতিও বাঁধের কাজে ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যা-বাঁধ ভাঙ্গার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর ফলে প্রতিবছর কোন না কোন হাওর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় এবং এসব এলাকায় বসবাসকারী লোকজনও চরম দুর্ভোগের শিকার হয়।

৫.২ স্থানীয় বাস্তবতায় পিপিআর'এর কার্যকরিতা

২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় (অর্থ মন্ত্রণালয়) 'পাবলিক প্রক্রিউরম্যান্ট রুলস' বা 'পিপিআর' প্রণয়ন করার পর থেকে প্রতিটি সরকারি কাজের ক্ষেত্রে 'পিপিআর'এ বর্ণিত নিয়ম-নীতি মেনে সরকারি ক্রয়-বিক্রয়গুলো সম্পন্ন হচ্ছে। পাউবো-সুনামগঞ্জ সরকারের পানি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে 'পিপিআর'-কে মেনেই হাওর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করে থাকেন। কিন্তু 'পিপিআর'-এ বেশ কিছু সমস্যার কারণে স্থানীয় বাস্তবতায় 'পিপিআর'-কে হাওরে ডুবো বাঁধ নির্মাণে কার্যকর বলে মনে হয়নি। 'পিপিআর' মেনে হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যাগুলোর তৈরী হচ্ছে সেগুলো নীচে আলোচনা করা হলো।

৫.২.১ অনিয়ন্ত্রিত লেস

পিপিআর-২০০৮ এর *ধারা ৯৮ (২১) এর (ক)*-অনুসারে সর্বনিম্ন দর দাতাকেই কার্যাদেশ দেওয়ার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে প্রাক্কলিত অর্থের সর্বোচ্চ 'লেস' প্রদানকারীকে কার্যাদেশ প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাকে মূল্যায়ন করার বিধান পিপিআর-এ রাখা হয়নি। এর ফলে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ পাওয়া নিশ্চিত করতে অযৌক্তিক 'লেস' বা মূল্য ছাড় দেওয়া হয় যা কখনোই বাস্তবসম্মত নয়। এতে করে 'লেসে'র ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক বাঁধ নির্মাণের দরপত্রে ঠিকাদার কর্তৃক মূল প্রাক্কলিত বাজেটের ৭২% পর্যন্ত ছাড় দিয়ে কাজ নেওয়া হয়েছে[৩২]। প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে যদি ৭২% ছাড় দিয়ে একজন ঠিকাদার কাজ সম্পাদন করে লাভ করতে পারে তাহলে প্রশ্ন থাকে: প্রাক্কলিত বাজেটটি আসলেই কি নিয়ম রক্ষার খাতিরে তৈরী করা হয়েছে নাকি ঠিকাদারদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা তৈরী করে কিছু অসাধু ব্যাক্তি লাভবান হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে?

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত দুই বছর (পূর্বে পিআইসি পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন হওয়ায় সে সময় 'লেস' ব্যবস্থাটি কার্যকর ছিলনা) প্রতিটি কার্যাদেশে গড়ে ৫৫% করে ছাড় দিয়ে কাজ পেয়েছিলেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে কাজের মান হয়েছে নিম্নমূখী এবং হাওরের ফসল ছিল হুমকীর মুখে। যদিও গত দুই বছর বন্যার তীব্রতা এবং আকাল বন্যার প্রভাব হাওরাঞ্চলে ছিলনা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কাজের তত্বাবধানের কারণে কাজের মান মোটামুটি ভালো হয়েছে বলে স্থানীয় সাধারণ জনগণ মনে করেন। তবে 'লেস' পদ্ধতিতে সত্যিকার অর্থে কাজের মান কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তার একটি বাস্তবসম্মত উদাহরণ নীচে সারণি-১৭ এ উপস্থাপিত হলো।

সারণি-১৭: 'পিপিআর' অনুযায়ী প্রতিটি কাজে অনুমিত ছাড়ের পরিমাণ

বিবরণ	লেসের পরিমান/ভ্যাট/ ট্যাক্স ইত্যাদি	ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
দরপেত্র লেস (গড়)	৫৫.০%	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক
ভ্যাট এবং ট্যাক্স	৮.৫%	সরকার কর্তক নির্ধারিত
মূল ঠিকাদারের লভ্যাংশ (সর্বনিম্ন)	১০.০%	অনুমিত (এফজিডি, ঠিকাদার)
সাব-ঠিকাদারদের লাভ (সর্বনিম্ন)	৫.০%	অনুমিত (এফজিডি, সাব-ঠিকাদার)
মোট	**৭৮.৫%**	

তথ্যসূত্র: পাউবো কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য, এফজিডি ও মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

সারণি-১৭ অনুযায়ী আমরা যদি ধরে নিই একটি কাজের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট ধরা হয়েছিল ১০০ টাকা, তাহলে দেখা যায় 'লেস', সরকারি ভ্যাট ও ট্যাক্স, মূল ঠিকাদারের লভ্যাংশ এবং সাব-ঠিকাদারের লাভ্যাংশ প্রভৃতি বাদ দেওয়ার পর মাত্র ২১.৫% টাকা বাঁধের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ থাকে। এরপর আছে প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি। এক্ষেত্রে জরিপে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের মধ্যে প্রায় সবাই পাউবো'র অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঘুষ প্রদান সাপেক্ষে কাজ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন। ফলে পাউবো'র ঐসব কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রদত্ত ঘুষসহ আরো বেশ কিছু আনুসঙ্গিক খরচ বাদ দিলে বাঁধের কাজে ব্যবহার হওয়া অর্থের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৫% থেকে ১২% টাকায়। এ ব্যাপারে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্মকর্তাদের অভিমত হলো-পিপিআর এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী তারা দরপত্রের প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে।

[৩২] তথ্যসূত্র: অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য। যা পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত দরপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এ কারণে সর্বোচ্চ 'লেস' প্রদত্ত ব্যক্তিকেই কার্যাদেশ দিতে তারা বাধ্য থাকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু আছে-তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রদত্ত লেসের পরিমাণ এতো বেশি হয় যে, কাজের মানের ব্যাপারে তারা নিজেরাই সন্দিহান হয়ে পড়েন। 'পিপিআর' ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ 'লেস' প্রদানের প্রতিযোগীতা তৈরী করে দিয়েছে বলেও পাউবো-কর্মকর্তারা মনে করেন।

৫.২.২ *দীর্ঘ প্রক্রিয়া*

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্রের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়াটি এতো দীর্ঘ যে, অনেক ক্ষেত্রে কার্যাদেশ পাওয়ার পর বাস্তবায়নে যাওয়ার পূর্বেই বন্যার পানি এসে হাওরগুলো ভাসিয়ে নেয়। পিপিআর-২০০৮ পর্যালোচনা করে দেখা যায়-প্রকল্পের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ দেওয়া পর্যন্ত সর্বনিম্ন ৪ মাস সময় প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ের কারণে-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা কমে আসে (১৫-৩০ দিন)। ফলে বাঁধের মাটি ভরাট হলেও তা মজবুত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন তা পাওয়া যায়না।

সারণি-১৮: দরপত্র প্রক্রিয়ায় কার্যাদেশ প্রদানের আনুমানিক ব্যয়িত সময়

মূল কার্যক্রম	বর্ণনা	ব্যায়িত সময়
পরিকল্পনা	➢ ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩০ দিন (অনুমিত)
দরপত্র তৈরী	➢ ক্রয়ের উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ ➢ উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ ➢ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্দিষ্টকীকরণ ➢ পূর্বের দরপত্রের উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ দরপত্র তৈরী ➢ দরপত্র আহ্বান প্রস্তুতকরণ	৬০ দিন (অনুমিত)
দরপত্র আহ্বান, গ্রহন এবং প্রক্রিয়াকরণ	➢ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদাণ ➢ প্রয়োজনীয় তথ্যের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধণ করা ➢ দরপত্র গ্রহন এবং বাছাইকরণ প্রক্রিয়া	২৮ দিন (দরপত্র আহ্বানে ২১দিন এবং প্রক্রিয়াকরণে আরো ৭ দিন)
দরপত্র পরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন	➢ দরপত্র পরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ➢ দরপত্রের সময়ের গ্রহনযোগ্যতা মূল্যায়ন ➢ দরপত্রের নিরাপত্তা অর্থ সংগ্রহ ➢ কার্যাদেশ প্রদান	১৫ দিন (অনুমিত)
কার্যাদেশ পূর্ণমূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন	➢ কার্যাদেশ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহতিকরণ ➢ চুক্তি স্বাক্ষর ➢ দরপত্রের পুরো প্রক্রিয়ার তথ্য সংরক্ষণ	২৮ দিন (কার্যাদেশ প্রদানের সময় ২১ দিন এবং প্রক্রিয়াগত কারণে আরো ৭ দিন)
মোট ব্যয়িত সময়		**১৬১ দিন বা ৫ মাস (অনুমিত)**

তথ্যসূত্র : পাউবো কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য, এফজিডি এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

গবেষণায় দেখা যায়, পিপিআর অনুসরণ করে দরপত্র পরিকল্পনা থেকে কার্যাদেশ দেওয়া পর্যন্ত প্রায় ৫ মাসের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। এছাড়াও কাজ বাস্তাবায়ন করতে গিয়ে আরো প্রায় ২ মাসেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন। অর্থ্যাৎ দরপত্র পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় ৭ মাসের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। হাওর বাস্তবতায় অক্টোবর-নভেম্বর মাসের পূর্বে বাঁধ নির্মাণের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই দরপত্র প্রক্রিয়া যদি অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শুরু হয় তাহলে কাজ বাস্তবায়ন পর্যন্ত এপ্রিল-মে মাসের পুরো সময়টি লেগে যাবে, অথচ ঐ সময়টিই হলো হাওর এলাকায় অকাল বন্যার সময়।

খোলা দরপত্রের মাধ্যমে একটি কার্যাদেশ প্রদান করে তা বাস্তবায়ন করার পূর্বেই অকাল বন্যায় হাওরের ফসল তলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় সব উত্তরদাতাই স্বীকার করেছেন, পিপিআর-এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে গিয়েই অযথাই এই সময়ক্ষেপণ হয়। অনেক সময় কাজ বাস্তবায়নের দুই একদিনের মধ্যেই বন্যার পানি এসে বাঁধ ভেঙ্গে হাওরে ঢুকে পড়ে এবং ব্যাপক ফসলহানী ঘটায়।

৫.২.৩ *'ওভার এস্টিমেশন'র সুযোগ সৃষ্টি*

'পিপিআর' অনুযায়ী দরপত্র পরিকবল্পনা এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সামগ্রি ও মজুরীরর সম্ভাব্য পরিমাণ এবং গুণগতমান উল্লেখপূর্বক দরপত্র আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সামগ্রি বা মজুরীর সর্বনিম্ন হিসাব ধরে একটি বাজেট পেশ করেন। গবেষণায় পাউবো'র কাজে অতিরিক্ত/অনিয়ন্ত্রিত লেসের কারণ আলোচনায় বেশিরভাগ উত্তদাতাই বলেছেন-ওভার এস্টিমেশানের কথা। তাঁরা মনে করেন ওভার এস্টিমেশানের কারণে

ঠিকাদাররা গড়ে ৫৫% লেসে কাজ নিয়েও লাভবান হন। উল্লেখ্য যে, পাউবো কর্তৃক কাজের এস্টিমেশানে যে অতিরিক্ত এস্টিমেশান হয় তার পরিমাণ প্রায় কয়েকশত গুণ পর্যন্ত বেশি হয়।

৫.২.৪ পিপিআর পরিবেশ বান্ধব নয়

পিপিআর এ বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প এলাকার ভৌগলিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই। ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের পাশাপাশি সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে হাওর অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কোন ক্ষেত্রেই পরিবেশ বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভৌগলিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হাওরের মধ্যে দিয়ে সড়ক নির্মাণের ফলে একদিক দিয়ে যেমন বহু টাকা ব্যায় করে নির্মিত সড়কটির স্থায়ীত্বকাল ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে অন্যদিকে তা হাওরের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.২.৫ 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র নামে অবাধ দুর্নীতি

'পিপিআর-২০০৮' অনুযায়ী মূল কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে বাঁধের অন্য কোন স্থানে আরো বেশ কিছু অতিরিক্ত কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাহলে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সে কাজও করতে পারবে উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি। সুনামগঞ্জ হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় 'এ্যাসেসম্যান্টের' সময় বাঁধ পানির নীচে ডুবে থাকার অজুহাতে মূল কাজ করানোর পরও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এবং পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক 'ভেরিয়েশন ওয়ার্ক' বা অতিরিক্ত কার্যাদির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই 'ভেরিয়েশন ওয়ার্কে'র নামে অবাধে দুর্নীতি এবং অনিয়ম সংগঠিত হচ্ছে।

৫.৩ পিআইসি পদ্ধতি কি সত্যিকার অর্থেই সময় সাশ্রয়ী

পিআইসি নীতিমালা অনুযায়ী যে পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিআইসি পদ্ধতিতে সময় কম ব্যয় হবার কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে এই পদ্ধতিতেও বাঁধ নির্মাণে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মতো দীর্ঘ সাত মাস সময় ব্যয় হয়েছে। পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়াটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) নীতি পর্যায়ে সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ, (২) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন (ফ্লো-চার্ট-৫)। জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সম্ভাব্য কাজের একটি তালিকা তৈরী করে ১৫ই আগস্টের মধ্যে পাউবো-সুনামগঞ্জের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করার নির্দেশণা রয়েছে। পরবর্তীতে পাউবো-সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক কাজের যাচাই-বাচাই সম্পন্ন করে ১৫ দিনের মধ্যে কাবিখা দপ্তরে প্রয়োজনীয় কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও অর্থের পরিমাণ সম্বলিত একটি বিবরণী প্রেরণ করতে হয়।

সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী (বা সার্কেল প্রধান) কাবিখা, পাউবো ও জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রেরিত কাজের তালিকা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাজেট একীভূত করে সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশনামা প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে প্রায় এক মাস সময় ব্যয় হয়/বরাদ্দ রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩ কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের নির্দেশণা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি পাউবো-সিলেট এবং সুনামগঞ্জের বাস্তবায়ন ও তদারকী অফিসে প্রেরণ করা হয়। এরপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে বরাদ্দ আদেশ আসে। বরাদ্দ পাওয়ার পর মাঠ পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ বাস্তবায়নে যায়। তার মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক একজন করে প্রতিনিধিসহ পিআইসি গঠন করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

চিত্র-৫: পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণে ব্যয়িত সময়ের ব্যাপ্তির ফ্লো-চার্ট

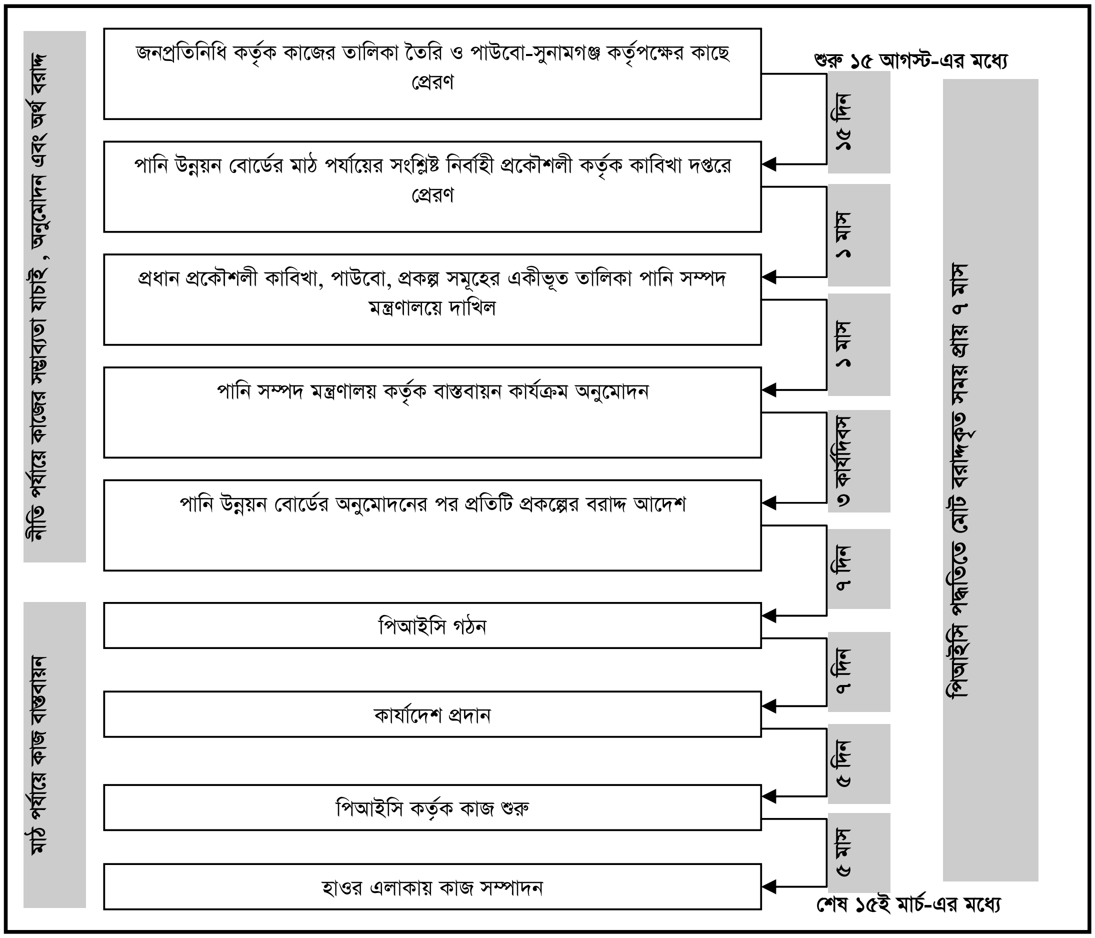

তথ্যসূত্র : পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত, এফজিডি এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।

উপরোক্ত ফ্লো চার্ট-৫ এ দেখা যাচ্ছে, পিআইসি পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ ও বাস্তবায়নের কাজে টেন্ডার পদ্ধতির মতো অনেকগুলো জটিল ধাপ অতিক্রিম না করলেও মোট ব্যয়িত সময় টেন্ডার পদ্ধতির মতোই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় হয়। পিআইসি পদ্ধতির নীতি পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে প্রায় ৭ মাসের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় বলে গবেষণায় পাওয়া গেছে।

৫.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া ও সময় সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়

১৯৯২ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য ‘ধারিত্রী সম্মেলনে’ বলা হয়েছিল-একবিংশ শতাব্দির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোকে জড়িয়ে ফেলার ফলে সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলাফল। অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথাপি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে সাথে পৃথিবীর পরিবেশের উপর যে প্রভাব পড়বে তাকে রোধ করা হবে এ শতাব্দির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ‘আইপিসিসি’ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার এবং প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ‘আল গোর’ তার লেখায়-মানুষ যে তার দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিবেশের উপর নেতিবাচক হস্তক্ষেপ করছে এবং এর মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এর একটি সম্ভাব্য সমাধানও দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ‘আগামী প্রজন্ম এবং জীবনের জন্য উন্নয়নগুলোকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ, নতুবা প্রযুক্তি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডগুলো মানব জীবনে শহস্রাব্দের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসবে’। সে হিসেবে হাওরকে পরিবেশের নিবিড় ক্ষেত্র বলা হলেও হাওরের বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ নীতিমালাগুলো কখানোই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খায় না। যেমন: পূর্বে হাওর এলাকায় যে উচ্চতায় বাঁধ নির্মাণ করা হতো বর্তমানেও প্রায় একই উচ্চতায় বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য মতে গত ৩০ বছরে হাওর এলাকার উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে হাওরে বালি প্রবেশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদী জমির পরিমাণও দিন দিন কমে যাচ্ছে। নীচের সারণি-১৯ এর মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের সাথে হাওর এলাকার পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ এবং ফলাফলগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সারণি-১৯: হাওর এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ এবং ফলাফল।

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ		পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলাফল
প্রাকৃতিক কারণ	পাহাড়ী ঢলের সঙ্গে আসে কোটি কোটি টন পলি মাটি	১. দিনে দিনে ভাটি এলাকার নদী-নালা, হাওর-বাওর ভরাট হয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে ২. নৌ-চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া ৩. নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়া, ৪. অল্পতেই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়া ৫. হাওর এলাকায় বালির স্তর পড়া
	হাওর এলাকায় বালির স্তর পড়া	বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের জমি অনাবাদী হয়ে যাওয়া
মনুষ্যসৃষ্ট কারণ	হাওর অঞ্চলে বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ, স্লুইচ গেইট নির্মাণ,	যেসব খাল হাওরের বিলগুলোকে নদীর সাথে যুক্ত করতো সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও লালনভূমিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং জলজ প্রাণবৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ
	চাষাবাদের জন্য জমিতে অধিক মাত্রায় সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ	মাছের প্রজণন ক্ষেত্র ও লালন ভূমিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং জলজ প্রাণবৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে

তথ্যসূত্র: সিএনআরএস, ২০০৬।

৫.৫ হাওর রক্ষায় বাঁধ নির্মাণ এবং সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক

পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হাওর রক্ষা বা হাওরের ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও তদারকি করা। হাওরের ফসল রক্ষায় পাউবো-সুনামগঞ্জ ডুবো বাঁধ নির্মাণ, পূর্ণ:নির্মাণ ও সংস্কার এবং স্লুইচ গেইট নির্মাণ করে। এই বাঁধ নির্মাণের সাথে হাওর এলাকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার জনগণ প্রধানত একটি ফসলের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক নিবিড় কৃষি কাজের সুবিধা এখানে পাওয়া যায় না। কারণ, বছরের প্রায় ৮ মাসই এলাকার হাওর ভুমিগুলো জলমগ্ন থাকে। তাই একমাত্র উৎপাদিত ফসলটির উপর এলাকার জনগণের নির্ভরশীলতার মাত্রা অনেক বেশি। এ কারণে, বাঁধ ভেঙ্গে ফসলহানী ঘটার ফলে এলাকার জনসাধারণের আয় কমে যায় এবং জীবন ধারণ ও পরের বছরে চাষাবাদের জন্য বাধ্য হয়ে ঋণ করতে হচ্ছে। পরপর কয়েক বছর বাঁধ ভেঙ্গে ফসল নষ্ট হলে এলাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং আঞ্চলিক দরিদ্র্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় দরিদ্র্যতার হারও বেড়ে যায়। ফলাফল স্বরূপ মানুষের মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য, যেমন-শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, আয়, সামাজিক অসমতা ও আয় অসমতা, পচ্ছাদপদতা প্রভৃতির ধারা নিম্নমূখী হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, শুধুমাত্র সঠিকভাবে বাঁধ নির্মাণ করে এবং হাওরের ফসল রক্ষা করে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক দরিদ্র্যতার মাত্রা এবং জাতীয় দরিদ্র্যতার ক্রমবর্ধমান হারকে হ্রাস করা সম্ভব। আর এ জন্য যে কাজটি সবার আগে করতে হবে সেটি হলো-হাওর রক্ষার বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ের অনিয়ম এবং দুর্নীতি বন্ধ করা এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কারণ, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধের উপর নির্ভর করেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস, মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরসহ আরো বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণায় পাউবো-সুনামগঞ্জ কর্তৃক হাওরের ফসল রক্ষার বাঁধ নির্মাণ, পূর্ন:নির্মাণ এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাত্রা/ব্যাপকতা কমানো গেলে সুনামগঞ্জের হাওরবাসী জনগণের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

সুনামগঞ্জসহ আরো প্রায় ৬টি জেলা নিয়ে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল বিস্তৃত। এর মধ্যে সিলেট অঞ্চলের প্রায় সবকটি জেলা এবং নেত্রকোনা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ জেলায় এর বিস্তৃতি। গবেষণার এলাকা সুনামগঞ্জ জেলার আর্থ-সামাজিক বাস্ত বতার সাথে অন্যান্য হাওর এলাকার এবং দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তুলনা মুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, ভূমির মালিকানা, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের জনগণ অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। এছাড়াও শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, প্রাত্যহিক ক্যালরি গ্রহনসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সার্বিক চিত্রের সাথে বিশেষ করে হাওর জেলাগুলোর চেয়েও তুলনামূলক কম।

এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের জন্য হাওর এলাকায় কাজ করে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমস্ত অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করে প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করলে হাওরের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সে লক্ষ্যে পরবর্তী অধ্যায়ে হাওর এবং হাওরবাসী জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আলাদা হাওর বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সুপারিশমালাকে গাইড লাইন ধরে হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পেছনে প্রেষণা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে ব্যক্তির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা-সকল বিষয়ই জড়িত। ফলে এ অঞ্চলের প্রধান ফসল যখন আগাম বন্যার কারণে প্রতিবারই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন সাধারণ মানুষের এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ থাকে না। গবেষণায় সুনামগঞ্জ জেলার অর্ধেকের বেশী জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার ফলে বোরো ফসল রক্ষা করতে পারলে এর সুফল খুব সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে যায়। ফলে এই অর্থ দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করার সুযোগ তৈরি হতো। কিন্তু প্রতিবারই ফসলহানী, বিনোয়গকৃত অর্থ নষ্ট হওয়া, অর্থ নষ্ট হওয়ার কারণে নতুন করে ঋণ গ্রস্থ হওয়া, আগামী বছরের জন্য নতুন করে আবার চেষ্টা করা-ফলে অমিত সম্ভাবনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই সম্ভাবনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যাচ্ছে না। গবেষণায় অন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে হাওর উন্নয়নের বিদ্যমান নীতিমালা। অন্যান্য অঞ্চলের থেকে হাওর অঞ্চলের বাস্তবতা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকারি নীতিমালায় কোথাও এর প্রতিফল নেই। যেগুলো আছে তারও সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যাচ্ছে না। ফলে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন থেকে যাচ্ছে সুদূরপরাহত। উন্নয়ন কর্মকান্ডের আরেকটি দুর্বল দিক হচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাব। পূর্বের কাজের সাথে পরবর্তী কাছের কোন মিল বা ধারাবাহিকতা নেই। অধিাকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাৎক্ষণিক সমস্যাকে মোকাবেলা করার কৌশল থেকে। ফলে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব এবং হাওর অঞ্চলের বাস্তবতা মাথায় রেখেই নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে হাওর জেলা সমূহের জন্য ভিন্ন নীতিমালার দাবীও নতুন কিছু নয়। অনেক উদ্যোগই নেওয়া হয় কিন্তু পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন নেই। ফলে সমস্যাগুলোও পুরনো, সুপারিশগুলোও পুরনো, উদ্যোগ নেবার আশ্বাস পুরনো যা কিছু নতুন তা হচ্ছে সমস্যার চেহারা। পুরনো সমস্যার সমাধান না হওয়ায় পূর্বের সমস্যাগুলো নতুন চেহারা নিয়েই দেখা দিচ্ছে।

হাওরের রয়েছে দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী চিত্রঃ শুকনো মৌসুমে যা আদিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ, বর্ষার সময় তাই রূপ নেয় প্রায় কূল-কিনারহীন বিশাল জলরাশিতে। পানি উন্নয়ন বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে সুনামগঞ্জ জেলায় হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, স্লুইচ গেইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। কিন্তু কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণের অভাব, টেন্ডার পদ্ধতি স্থানীয় পরিবেশ বান্ধব না হওয়ায়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে পানি উন্নয়ন বোর্ড-সুনামগঞ্জের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য কতটুকু পূরণ হচ্ছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু হাওর জেলা সুনামগঞ্জে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালার মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উঠে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে টিআইবি এবং সচেতন নাগরিক কমিটি-সুনামগঞ্জ হাওর উন্নয়নে তথাপিও হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। নীচে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ সাপেক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালাটি তুলে ধরা হলো।

৬.১ সুপারিশমালা

হাওর অঞ্চরের ভৌগলিক বাস্তবতা থেকে হাওরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী হচ্ছে কার্যকর হাওর উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা। কিন্তু বোর্ড গঠনের দীর্ঘ সময় পরও বোর্ডের কার্যক্রমের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান হাওর অঞ্চলে নেই। হাওরবাসীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ হাওর অঞ্চল সমূহের জন্য পৃথক একটি নীতিমালা প্রণয়নের দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। হাওর ঘোষণায় এরই প্রতিফলন দেখা যায়। এই অঞ্চলের জন্য প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। তাই টিআইবি ও সনাক-সুনামগঞ্জ বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জোড় তাগিদ অনুভব করছে।

ক. <u>পাউবো-সুনামগঞ্জ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুপারিশ</u>

১. ডুবো বাঁধের স্থান নির্ধারণ ও ডুবো বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
২. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, বাজেট প্রাক্কলন এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিবীক্ষণ সম্পর্কে এলাকার মানুষকে অবহিত করতে হবে।
৩. বাঁধের নকশা, নির্মাণ কাল, নির্মাণ স্থান, নির্মাণ ব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পাউবো-সুনামগঞ্জ সোশ্যাল অডিট (সামাজিক নিরীক্ষা) ও বাজেট ট্র্যাকিং (বাজেট পর্যবেক্ষণ) করে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. প্রতিটি টেন্ডার প্রদানের পূর্বে সততা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের সাথে পাউবো-সুনামগঞ্জ 'সততার অঙ্গিকার/চুক্তি' সম্পাদন ও তা কার্যকর করবে।

৫. পাউবো-সুনামগঞ্জ এবং ঠিকাদার বাঁধের ঢাল এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘাস এবং উপযুক্ত গাছের আচ্ছাদন সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁধের মাটির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করবে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন প্রতিটি কাজ সম্পর্কে তথ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নাম নির্ধারিত প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের বিলবোর্ডে স্থাপন করতে হবে।

৭. নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু এবং শেষ করার লক্ষ্যে পাউবো-সুনামগঞ্জ'কে যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

৮. বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন যাচাই, নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রাক্কলন, বাঁধ নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পাউবো-ঢাকার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সুপারিশ

৯. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনোরূপ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে অনুসন্ধান সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আর্থিক জরিমানা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে ভালো কাজের জন্য তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।

১০. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতি বছর সরকারের নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে। তাদের আয়ের বৈধ উৎসের সাথে সম্পত্তির অসংগতি প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে হবে।

১১. পাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রস্তুত করতে হবে।

১২. হাওর এলাকায় ডুবো বাঁধ নির্মাণের বাস্তবতায় 'পিআইসি' পদ্ধতিকে বিবেচনা করতে হবে এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে।

১৩. ওভার এস্টিমেশন রোধকল্পে এলাকাভিত্তিক বাজারদর বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করতে হবে। এক্ষেত্রে ৫%-১০% কম-বেশির সুযোগ রাখা যেতে পারে।

১৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিয়মিত টেকনিক্যাল/ফিজিক্যাল অডিট করতে হবে।

১৫. হাওর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আন্তঃহাওর পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর সহায়তায় হাওর অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে অতি দ্রুত জনগণ এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।

১৭. হাওরের প্রকৃতি-পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় এ অঞ্চলকে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা করে সমন্বিত এবং 'হাওর বান্ধব' নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৮. হাওর এলাকায় অতি বা অকাল বন্যা হতে সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অতি দ্রুত সুরমা নদীর উৎসমুখে ড্রেজিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমন্বিত এবং সুষ্ঠুভাবে উপরোক্ত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করলে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। তবে পরিকল্পনা গ্রহন এবং বাস্তবায়নসহ প্রতিটি পর্যায়েই হাওরবাসী জনগণের মতামত এবং অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। টিআইবি বিশ্বাস করে হাওরবাসীর জন্য যে আয়োজন তাতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়মূলক কর্মকান্ড পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না এবং সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভবপর হবে না।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. A.w. Akonda, ***'Bangladesh (1989)'*** in DA Scott edt, *A Directory of Asian Wetlands*, IUCN, Switzerland.

২. ***`Bangladesh Floods: Views from home and abroad (1998)'***, Edited by Mir M. Ali, Mozzammel Hoque, Rezaur Rahman, Salim Rashid, UPL, Bangladesh.

৩. James J. Novak; ***'Bangladesh: Reflection on the Water (1993)***, UPL; Bangladesh.

৪. K.B. Sajjadur Rasheed; ***'International river basins development environmental challenges and options (1994);*** in: Management of international river basins and environmental challenges, Academic Publishers and Bangladesh national committee of international commission on irrigation and drainage (ICID-Bangladesh).

৫. Mohammad Rezaur Rahman & Jahir Uddin Chowdhury; ***'Impact of Flood Control Project in Bangladesh (1998)';*** UPL, Bangladesh.

৬. M Salar Khan *et al* ed, ***'Wetlands of Bangladesh' (1994),*** Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka.

৭. M. Youssouf Ali; ***'Fish, Water and People: Reflection on the open water fisheries resources of Bangladesh' (1997)***; UPL, Bangladesh.

৮. ***'Planning and Management of Water Resources: Lessons from two Decades of Early Implementation Project' (1999)***; Edited by Anjan K Datta, UPL, Dhaka, Bangladesh.

৯. ***'Rivers of life: Bangladeshi Journalists take a critical look at the flood action plan' (1994);*** Editor-Kelly Haggart; BCAS/PANOS; Dhaka.

১০. The Public Procurement Rules (PPR) -2008 (Gazette-Bangla Version).

১১. Website: http://www.bangladesh-web.com/preview.php

http://www.mowr.gov.bd/haor.htm

www.bwdb.gov.bd/haor.htm

www.bwdb.gov.bd

১২. শিপন রহমান, ***'বাংলাদেশের নদ নদী' (২০০৫)***; হাতেখড়ি প্রকাশনী, ঢাকা।

১৩. জ্যোর্তিময় বসু, ***'নদ-নদী এবং বন্যা' (১৯৯৯)***; পাক্ষিক চিন্তা: ২১-২২, ঢাকা।

১৪. মুজিব মেহদী; ***'হাওর: জলে ভাসা জনপদ'*** (২০০৫)***;*** আইডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৫. *কৃষি, প্রকৃতি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, নীতিমালা ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা বিষয়ক জনসমীক্ষা (২০০৭);* সম্পাদণায় সুকান্ত সেন; বারসিক, বাংলাদেশ।

১৬. জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায় ও বিদিশা মালিক; *'পশ্চিমবঙ্গ: ক্ষীণকায় প্রকৌশল এবং সংঘাত' (২০০৪);* দেজ পাবলিকেশানস, ভারত।

১৭. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৬/০৯/২০০০ইং, নং পাসম-উঃ৫/বিবিধ-১৯/২০০০/৩৮৩।

১৮. প্রতিবেদন - ২০০৪; এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং সিএনআরএস কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত।

১৯. পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন

ক. সাপ্তাহিক জুরী সংবাদ, ০১ জানুয়ারী ২০০৬।

খ. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

গ. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

ঘ. দৈনিক সংবাদ, ১১ মার্চ ২০০৬।

ঙ. দৈনিক যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০০৮।

চ. সাপ্তাহিক গ্রাম বাংলার কথা, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

ছ. সাপ্তাহিক গ্রাম বাংলার কথা; ৪ মার্চ ২০০৭।

জ. The daily Star, 27 March 2006.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: বাংলাদেশ, হাওর অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জের পেশার মধ্যকার তুলনা

পেশা	বাংলাদেশ (%)	হাওরাঞ্চল (%)	সুনামগঞ্জ জেলা (%)
কৃষি	৪৮.১	৬৩.১৬	৭০.৮৭
অকৃষি	৫১.৯	৩৬.৮৪	২৯.১৩
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)

পরিশিষ্ট-২: সুনামগঞ্জ জেলার সার্বিক শিক্ষা তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষা	নারী শিক্ষার হার (%)	পুরুষ শিক্ষার হার (%)	মোট শিক্ষার হার (%)
বাংলাদেশ	৪৭.৫	৫৩.৯	৪০.৮
হাওরাঞ্চলের গড়	৩৭.৬১	৩৩.৮৭	৪১.২৭
সুনামগঞ্জ জেলা	৩৪.৪	২৯.৯	৩৭.৫

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)

পরিশিষ্ট-৩: হাওর অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জের শিক্ষার অবকাঠামোগত তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষার অবকাঠামো	প্রাথিমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মাদ্রাসা	কলেজ
হাওরাঞ্চলের গড়	১০৭৬টি	২৬১টি	৭৫৬টি	২০টি
সুনামগঞ্জ জেলা	৮৯৫টি	৯৮টি	৫২০টি	১৩টি

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)

পরিশিষ্ট-৪: ভুমিহীন পরিবারের তুলনামূলক চিত্র

পেশা	বাংলাদেশ (%)	সিলেট বিভাগ (%)	সুনামগঞ্জ জেলা (%)
	৪০.১	৫০.৭৪	৩৩.০০

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)

পরিশিষ্ট-৫: হাওর অঞ্চলের এবং সুনামগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

যোগাযোগ ব্যবস্থা	পাকা (কি:মি:)	সেমি পাকা (কি:মি:)	নদী পথ (নটিক্যাল মাইল)
হাওরাঞ্চলের গড়	৪০০	১০৬	১২১
সুনামগঞ্জ জেলা	১৫০	৫২	৯৮

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)

পরিশিষ্ট-৬: হাওর অঞ্চলের সাথে সুনামগঞ্জের স্বাস্থ্যসেবার একটি তুলনামূলক চিত্র

স্বাস্থ্যসেবা	হাওরাঞ্চলের গড়	সুনামগঞ্জ জেলা
ডাক্তার	১৬১	৬৫
ডাক্তার-রোগী অনুপাত	১ঃ১০৯৪৭	১ঃ৩০৯৮১

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০০১)